জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ❑ দশম বর্ষ ❑ প্রথম সংখ্যা ❑ ৬ টাকা

মন্থন সাময়িকী

এক ফোঁটা চোখের জলের ভিতর থেকে ফুটে উঠল একটা ফুল
কী ঘটেছিল গ্রীসে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে পৃষ্ঠা ৩

নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের দখলে পৃষ্ঠা ৫

সংকটে বিশ্বায়ন পৃষ্ঠা ৮

ছোটো নজরে বিশ্বমন্দা পৃষ্ঠা ১৪

'নতুন নেপাল' এবং বৃহত্তর প্রেক্ষিতের প্রসঙ্গ
স্টিফেন মাইকসেলের সঙ্গে সংলাপ পৃষ্ঠা ১৮

নৈহাটির গৌরিপুর জুট মিল
বঞ্চনা ও ঘুরে দাঁড়ানোর কাহিনী পৃষ্ঠা ২৪

ধার করে ঘি খাওয়া অর্থনীতির ডুবে যাওয়ার দৃষ্টান্ত
আইসল্যান্ড পৃষ্ঠা ২

চিঠিপত্র :
বিষয় : সম্পাদকীয়/ আমার জ্বলেনি আলো পৃষ্ঠা ২৮

কর্পোরেট রাজনীতি এবং ভোটের রাজনীতি

"লাল ফিতের ফাঁসে খতম হল ১,৬৪,০০০ চাকরি"
[Red tape strangles 1,64,000 jobs – The Statesman, 3 March 2009]

৩ মার্চ ২০০৯ স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার খবরটা ছিল এইরকম : ২,৪৪,৮১৫.৫ কোটি টাকা মূল্যের ১৮টি প্রকল্পে, চুক্তি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও গত তিন–চার বছর ধরে সরকারি ঢিলেমির জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারেনি। এগুলোতে সরাসরি ১,৬৪,০০০ মানুষ এবং পরোক্ষভাবে আরও ২,৭০,০০০ মানুষ কাজ পেত। অ্যাসোচাম ইকো পাল্‌স সমীক্ষায় এটা জানা গেছে। এর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার ইস্পাত ব্যবসা 'পস্কো'–র উড়িষ্যার প্রকল্প; ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা ও ছত্তিশগড়ে টাটার তিনটি প্রকল্প এবং উড়িষ্যা ও ঝাড়খণ্ডে আর্সেলর–মিত্তালের দুটি প্রকল্প।

এই খবর একটা জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা। পস্কো, আর্সেলর–মিত্তাল বা টাটারা জমি পায়নি কেন? কারণ সেই জমি — বসতি, জঙ্গল বা চাষের জমি — যারা এতদিন ব্যবহার করে এসেছে, সেই স্থানীয় জনসমাজ দিতে চায়নি। সরকার তাদের বুঝিয়েছে, জমির মালিকদের টাকার লোভ দেখিয়েছে, অবশেষে সন্ত্রাস চালিয়ে হত্যা পর্যন্ত করেছে, কিন্তু জনপ্রতিরোধকে চূর্ণ করতে পারেনি। এটা হল প্রথম সত্য।

দ্বিতীয় সত্য হল, যে ইস্পাত, মোটরগাড়ি–নির্মাণ, তথ্য–প্রযুক্তি, রিয়েল এস্টেট ইত্যাদি শিল্পের জন্য জমি নিতে চাইছিল কর্পোরেট–সংস্থাগুলো, এখন সেইসব শিল্পে চলছে মন্দা। সেইসব ক্ষেত্রের চালু কারখানাগুলোতেই উৎপাদনে দম নেই, বাজার খারাপ, কর্মী ছাঁটাই চলছে নানানভাবে। নতুন শিল্প করার তাড়াহুড়ো সেখানে নেই।

তৃতীয় সত্য হল, চাকরির গল্পটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হচ্ছে। যুবসমাজকে লোভ দেখিয়ে নিরস্ত করে জমিটা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

কিন্তু কেন এই মিথ্যে খবরটাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে বড়ো মিডিয়া? লাল ফিতের ফাঁস মানে হল সরকারের অপদার্থতা। সরকারের অপদার্থতা মানে সরকারি ক্ষমতায় থাকা দলগুলোর অপদার্থতা। ভোটের রাজনীতিতে এক দল অপর দলকে অপদার্থ প্রমাণ করে নিজে ক্ষমতা দখল করতে চায়। দিল্লির ভোট এসে গেছে। কর্পোরেট কর্তারা জানে, এই খবরটা পাতে পড়লেই তা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে ভোটের রাজনীতি।

১৮টি প্রকল্প জনপ্রতিরোধে আটকে গেছে, এই খবর প্রকাশ করার সৎসাহস নেই পস্কো, আর্সেলর–মিত্তাল বা টাটাদের। চাষাভুষো, আদিবাসী, গরিব মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতার স্বীকৃতি দেওয়ার হিম্মত ওদের নেই। দলগুলোকে ওরা মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রাখতে চায়, পুষতে চায়, আবার দরকার মতো দুটো থাপ্পড়ও মারতে চায়। সেটাই ওদের পক্ষে সুবিধাজনক। ওদের প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যবসাজগতের দুর্নীতিগ্রস্ত জোড়াতালি দেওয়া চেহারাটাকে ওরা বিশ্বমন্দা শব্দটার আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চায়।

আমরা বিশ্বমন্দার বড়োসড়ো চেহারা আর তার প্রভাবকে ভেঙে ভেঙে বিশ্লিষ্ট করে দেখতে চাই। এবারের সংখ্যায় তার কিছুটা চেষ্টা করা হল। আমরা দেখতে পাচ্ছি : বিশেষ বিশেষ শিল্পে ব্যাপক শ্রমিক–ছাঁটাই; রোজকার মামুলি জিনিসপত্রের আগুন দাম; অর্থনীতির বেহাল অবস্থাতেও যুদ্ধের সাজগোজে খরচ বাড়ানো; জনমত গঠনে মিডিয়ার অসামান্য কার্যকলাপ; প্যালেস্তাইন–ইরাক–আফগানিস্তানে নির্লজ্জভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ–পাকিস্তান–ভারতে একটা অস্থির পরিস্থিতি তৈরির জন্য আমেরিকার মরীয়া চেষ্টা এবং এসবের বিপরীত মেরুতে জনতার এক জীবন্ত প্রতিরোধ — কখনও আমাদের নন্দীগ্রামে, কখনও দেশের বাইরে গ্রীসে বা নিউ ইয়র্কে। এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে বিশ্বমন্দার যোগ কোথায়?

পত্রিকার জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সংখ্যা প্রকাশে দেরি হওয়ার জন্য
পত্রিকার পক্ষ থেকে আমরা দুঃখপ্রকাশ করছি।

ধার করে ঘি খাওয়া অর্থনীতির ডুবে যাওয়ার দৃষ্টান্ত
আইসল্যান্ড

শমীক সরকার

২০০১ সালে আইসল্যান্ডের ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের আওতার বাইরে নিয়ে আসা হয়। তখন থেকেই তারা আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির বাজারে খেলা করতে শুরু করে। মর্টগেজ কিনে রাখা থেকে শুরু করে অল্প সময়ের চড়া সুদের ঋণ নেওয়া, লগ্নি বাজারে চলাফেরা করতে করতে এই ব্যাঙ্কগুলো হয়ে ওঠে আইসল্যান্ড রাষ্ট্রের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৬ গুণ বড়ো। বিদেশের বহু কোম্পানি ও মানুষ এই ব্যাঙ্কগুলিতে আমানত রাখতে শুরু করে, চড়া 'রিটার্ন'–এর আশায়। দেশের ভেতরেও মানুষ যাচ্ছেতাই ভাবে ধার করতে শুরু করে এই ব্যাঙ্কগুলি থেকে। দেশে মুদ্রাস্ফীতি শুরু হয়। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। যদিও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নিরিখে আইসল্যান্ড ফার্স্ট সেকেন্ড হতে শুরু করে। ২০০৭–এ আইসল্যান্ড ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতার নিরিখে বিশ্বে পঞ্চম, জন প্রতি আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের নিরিখে বিশ্বে চতুর্থ, কম বেকারত্বে ইউরোপে প্রথম সারিতে, ধনী–দরিদ্রের ফারাক খুব কম ...। এমনকী দেশের মানুষ কতটা সুখে আছে, তা মাপার নিরিখ (বিশ্বায়নের বাঁদিকের তাত্ত্বিকদের নির্মাণ) রাষ্ট্রপুঞ্জের হিউম্যান ডেভলপমেন্ট ইন্ডেক্স–এ বিশ্বে প্রথম হয়েছিল ওই বছর এই ছোট্ট দেশটি! ভোগে থাকলেই তো সুখে থাকা যায়!

সেই আইসল্যান্ড দেশটিই আজ দেউলে। ব্যাঙ্কগুলির হাতে কোনও লিকুইড ক্যাশ নেই, যা দিয়ে তারা আন্তর্জাতিক ছোটো সময়ের ঋণগুলি শোধ দিতে পারবে। বিদেশি লগ্নিকারীরা ফেরত চাইছে আমানত। দেশের মুদ্রার দাম তলানিতে ঠেকেছে। এ অবস্থায় ব্যাঙ্ককে ত্রাণ করে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, এটাই দস্তুর। কিন্তু এই ব্যাঙ্কগুলি যে দেশের চেয়েও কমপক্ষে ছ'গুণ বড়ো, তাই সে গুড়ে বালি পড়েছে।

সুখে থাকা আইসল্যান্ডের মানুষ হঠাৎ এই ২০০৮–এর শেষদিকে উপলব্ধি করে, তাদের সুখ রাতারাতি উবে গেছে। প্রবল জনবিক্ষোভ শুরু হয়। ত্রাণ পেতে আইএমএফ–এর দ্বারস্থ হয় দেশটি। ১৯৭৬ সালের পর এই প্রথম কোন একটি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশকে ঋণ দিয়ে আইএমএফ জানিয়ে দেয়, সে দেশে ব্যাঙ্কে সুদের হার এবার থেকে হবে ১৪ শতাংশ। এতদিন অনেক ধার করে ঘি খেয়েছো, এবার আঙুল চোষো।

প্রবল জনবিক্ষোভে দেশটির সরকারের পতন হয় ২০০৯ জানুয়ারির শেষে। ফেব্রুয়ারিতে এক সংখ্যালঘু বাম ঘেঁষা সরকারকে বসানো হয় ক্ষমতায়। মে মাসে সাধারণ নির্বাচন, নির্ধারিত সময়ের অন্তত একবছর আগে। এই দেশটির কোন সৈন্যবাহিনী নেই। আমেরিকাই সেসব দেখাশোনা করে। সাম্প্রতিক মার্কিন আগ্রাসন — ইরাক, আফগানিস্তান, যুগোস্লাভিয়া — সবেতেই এরা সোৎসাহে অংশগ্রহণ করেছিল।

আইসল্যান্ডের মানুষ মাছ ধরে খেত। এ দেশটি ১০০ বছর আগেও ছিল ইউরোপের সবচেয়ে দরিদ্র দেশ। কিন্তু গত দু'দশকে তারা তা যত না খেয়েছে, তার থেকে অনেক বেশি রপ্তানি করেছে। মোট রপ্তানির ৪০ শতাংশই মাছ রপ্তানি। এ ছাড়াও গত দু'দশকে এসবের বদলে পর্যটন, ইকো পর্যটন, তিমি পর্যটন, সফটওয়ার, ম্যানুফ্যাকচারিং, ফাইনান্স, বায়োটেকনোলজি — এসব দিকেই নজর দেওয়া হয়েছে বেশি।

সংকটগ্রস্ত পুঁজির হাল ফেরানোর দাওয়াই ছিল বিশ্বায়ন। মার্কিন দুনিয়ার তথা মার্কিনি কায়দার ভোগ নির্ভর জীবনকে জীয়নকাঠি ধরে নিয়ে গত দুই দশক ধরে বিশ্বজুড়েই উথাল পাথাল করে সেই পুনর্গঠন প্রক্রিয়া চলছিল। সস্তার অভিবাসী শ্রম, রপ্তানিমূলক উৎপাদন আর মার্কিন কায়দার ভোগী জীবনযাপনের আবিশ্ব উচ্চাকাঙক্ষা ছিল সেই প্রক্রিয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেই প্রক্রিয়া আজ আবার সংকটে পড়েছে। এ শতাব্দীর শুরুর হালকা সংকটকে ব্যবহার করা হয়েছিল বিশ্বজুড়ে এই পুনর্গঠনকে আরও জোরালো করার কাজে। এবার কী হবে? যাই হোক, এবারের সংকট কিন্তু জবরদস্ত, বিশ্বায়নের চাকচিক্য ফিকে হতে বসেছে সব দিক থেকে। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত দ্য টাইমস্ পত্রিকার এক কলমচি লিখেছেন, ভোগী পুঁজিবাদের দিন শেষ, এবার 'সহযোগিতার পুঁজিবাদ' (co-op

সংবাদমন্থন

পাক্ষিক খবরের কাগজ 'সংবাদমন্থন' প্রকাশিত হচ্ছে প্রতিমাসের ১ এবং ১৬ তারিখ। এবছর ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে নিয়মিত এই প্রকাশনার কাজ শুরু হয়েছে। প্রতি সংখ্যার দাম দু' টাকা। যাঁরা ডাকযোগে নিতে চান, তাঁরা সারা বছরের জন্য চল্লিশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হলে ডাকে কাগজ পাবেন। এছাড়া বিভিন্ন পত্র–পত্রিকার স্টলেও কাগজটি পাওয়া যাচ্ছে। যাঁরা সরাসরি আমাদের হাত থেকে নেবেন, তাঁরা 'বাকচর্চা', ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯ থেকে কপি সংগ্রহ করতে পারেন। এই ঠিকানায় প্রতি মঙ্গল ও শনিবার দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত আমাদের পাওয়া যাবে। এছাড়া সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

যোগাযোগের ঠিকানা
জিতেন নন্দী
বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : jiten_nandi@vsnl.net

সংবাদমন্থনে আপনার সরাসরি অভিজ্ঞতার খবর পাঠান।

ডিসেম্বরের সাত থেকে দশ তারিখ যা ঘটে গেল গ্রীসে, অনেকে আমাদের কাছে তার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবে ... সেই এক মেকি-গম্ভীর ভঙ্গি, সেই বড়োলোকি ফিটফাট পোশাক, ক্যামেরাম্যানের চোখ ধাঁধানো আলো, টিভি স্টেশন, সেই উদ্বিগ্ন আর মেকি-দরদি যত সাংবাদিক, যত বিলাসী সংবাদপত্র-মন্ত্রী-পার্লামেন্টের সদস্য-ব্যবসায়ী-রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী-ছোটো ছোটো দলের নেতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আর উত্তর আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ... কিন্তু কেউ সেখানে ছিল না ... তবে কেন একটা সামাজিক ব্যাপারকে ভাষান্তর করার জন্য আমাদের ওদেরকে দরকার? কখন কোন কাজে ওরা ওদের কর্তৃত্ব আর এগিয়ে থাকার প্রমাণ দিয়েছে? ... আমাদের জীবনে সত্যিই যা ঘটছে, ওরা কি তা বুঝতে সক্ষম?

অ্যালেক্সিস গ্রিগোরোপৌলস, একটা পনেরো বছরের বালক এক্সআরসিয়া স্কোয়ারের ধারে খুন হল। এক্সআরসিয়া হল এথেন্সের কেন্দ্রে অবস্থিত গ্রীসের গুপ্ত, অ্যানার্কিস্ট, স্বশাসিত, বাম আর নানান সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র — ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দুর্গের দক্ষিণ সীমান্তে বহুদূরের এক ধূ ধূ প্রান্তে সেই জায়গাটা ... সেই মুহূর্তে ওখানে কোন লড়াই ছিল না, অথবা ছিল না কোন ধরনের কার্যকলাপ, কেবল লোকে বিয়ার আর কফিতে চুমুক দিচ্ছিল, রাস্তার মোড়ে আর ক্যাফেটেরিয়ায় কথাবার্তা হচ্ছিল ... সমস্ত ক্যাফেটেরিয়ার সামনে, শনিবার রাতে, চৌমাথাটা ছিল জমজমাট, সবাই দেখতে পাচ্ছিল বাচ্চাদের সঙ্গে পুলিশেরা খেলছে; আর চেষ্টা করছে একটা পায়ে হাঁটা জায়গা, যেখানে যুবকেরা ভিড় করছে, তার মধ্যে দিয়ে পুলিশের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে সেই বাচ্চাদের প্ররোচিত করতে ... সকলেই ওকে পুলিশের গাড়ি থেকে নামতে দেখেছিল, পুরো পুলিশের পোশাকে শুধু নিজের কর্তৃত্ব আর পৌরুষ জাহির করতে একটা কথার লড়াইয়ে নামতে চাইছিল সে, এমন এক মুহূর্তে যখন ওখানে কোন লড়াই ছিল না ... গত তিরিশ বছরে কীভাবে কোন পুলিশ বা সরকার এক্সআরসিয়ায় নিজেদের কর্তৃত্ব আর দাদাগিরি ফলাতে পেরেছে? আদৌ কখনও পেরেছে কি? আমরা বেশ জানি যে গত কয়েক বছর ভিক্টর পলিডোরাস (প্রাক্তন মন্ত্রী) জেনেবুঝে জনশৃঙ্খলা মন্ত্রী থাকাকালীন এক্সআরসিয়া পুলিশ স্টেশনে ফ্যাসিস্ট অতি-দক্ষিণপন্থী পুলিশ-কর্মীদের নিয়োগ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এক্সআরসিয়া এলাকার অ্যানার্কিস্ট স্বশাসনকে আক্রমণ করা আর বাড়তি উত্তেজনা তৈরি করা ... এই হল ঘটনা, এটাই কারণ আর তার এই ফলাফল ... সেই রাতে পুলিশের গাড়িতে যে পুলিশটা ছিল, সে ছিল একজন নাৎসি, *একজন ফ্যাসিস্ট, জাতীয়তাবাদী মূর্খতাসম্পন্ন স্নায়ুরোগাক্রান্ত দানব*, সে এমন একটা মানুষ যে এই ছেলেমেয়েদের মনে করে শত্রু, উদ্ভট, আবর্জনা, যাদের সমাজ থেকে সাফ করে দেওয়া দরকার ... আর ঠাণ্ডা মাথায় সে ছেলেটার বুকে গুলি চালিয়ে দিল ... ওকে এখন জেলে আনা হয়েছে ... আমাদের কমরেডরা, গ্রীসের বন্দীরা ওর কাছে আমাদের থেকে ভালো করে ব্যাখ্যা করবে, একজন অ্যানার্কিস্ট বালকের নাৎসি হত্যাকারীর কী হবে, এই ২০০৮ সালের গ্রীসের এক জেলখানায় ...

সরকার সত্যিই মনে করেছিল যে স্বাধীনচেতা, স্বশাসিত, কর্তৃত্ববাদ-বিরোধী অ্যানার্কিস্ট ভাবনা এথেন্সের কেন্দ্রে একটা স্কোয়ারের মাঝে ৩০০ লোকের হৃদয়ে লুকিয়ে আছে ... কিন্তু তারা ভুল করেছিল ... আমাদের কমরেডের মৃত্যুর দশ মিনিটের মধ্যে গ্রীসের বিশটা আলাদা আলাদা শহরে পুরোদমে অ্যাকশন শুরু হয়ে গেল ...

প্রথম রাতটা ছিল এদেশের অ্যানার্কিস্ট, স্বশাসিত আর স্বাধীনচেতাদের, সারা দেশ জুড়ে ৩০,০০০-এর বেশি মানুষ, যেন সর্বত্র, উত্তরের সীমান্ত থেকে দক্ষিণের দ্বীপ পর্যন্ত, সকলে, কোনরকম নেতৃত্ব বা নির্দেশের তোয়াক্কা না করে, কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত ছাড়া, এমনকী কোনরকম সিদ্ধান্ত ছাড়াই ... প্রতিশোধের আগুন আর রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদের অসাম্য, সর্বগ্রাসীতা ও বিকারের বদলা নেওয়ার সাহস দীর্ঘকাল ধরেই প্রস্তুত ছিল ... সবই যেন আমাদের সকলের হৃদয়ে তৈরিই ছিল অনেকদিন ধরে ... কোন শলা-পরামর্শ না করে, কোন রাজনৈতিক প্রতিনিধি ছাড়াই, কোন নেতার অপেক্ষা না করে, কোন ধরনের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত ছাড়াই ... কেবল আমাদের হৃদয়ের ভিতরেই ছিল ...

আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, আমাদের সকলেই ... সব কিছু বদলাতে হবে আর নিশ্চিতভাবেই তা ঘটবে ... আমরা এই জগতের বদল ঘটাব মঙ্গলের জন্য; আর এক নতুন মানসিকতা ও মহান লড়াইগুলোর এক সাধারণ গণসাফল্যের ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্য এক দারুণ বিস্ময়ের মতো উঠে আসবে। কিন্তু তা আসবে এত সহজ স্বাভাবিকভাবে, যেমন বিশাল খোলা রাতের আকাশে তারাগুলো উঠে আসে ... অ্যালেক্সিসের খোলা উষ্ণ আর প্রাণভরা হাসির মতোই উঠে আসবে স্বাধীনতা আর সাম্য ...

যারা স্বাধীনতা আর সাম্য চায় না, তারা পাবে হট্টগোল। আর সকলেই এখন ভালোই জানে কেমন সেটা ... পুলিশ, সরকার, সমাজ, নতুন প্রজন্মের যুবকেরা এখন ভালোই জানে সামাজিক বিদ্রোহের চেহারাটা কেমন ... জনসাধারণের হৃদয়ে তাদের রোজকার জীবনে আবার বিপ্লবের আশা জেগে ওঠে ... যেসব টার্গেটগুলো জ্বালিয়ে, লুঠ করে, গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে গত তিন দিন, সেগুলোই তো একটা মানচিত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে, যখন আমরা মুক্ত আর সমান হব বলে ঠিক করব, তখন কোন জিনিসগুলো নিশ্চিহ্ন হওয়া দরকার ... আর তোমরা এখন জানো ... সেটা মোটেই কঠিন কিছু নয় ...

লড়াইয়ের দ্বিতীয় দিন আর সামনের দিনগুলো নতুন প্রজন্মের জন্য ... এইসব হাজার হাজার তরতাজা ছেলে আর মেয়ে যারা হঠাৎ সমস্ত প্রান্ত থেকে, সমাজের সমস্ত সামাজিক স্তর থেকে ব্যারিকেডে ভিড় করেছে আর গ্রীসের সর্বত্র লড়াই যেন বিদ্যুতের চমকের মতো আকাশ থেকে নেমে লক্ষ লক্ষ ভোল্ট শক্তি নিয়ে মাটিকে আঘাত করছে ...

একটা পুরনো গানে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে : "সব একাকী মানুষ ... কোথা থেকে তারা এল? সব একাকী মানুষ ... কোন পরিচয় পেল?"

তারা সব পাকিস্তান, মিশর, আলবেনিয়া, আফ্রিকা থেকে আসা — কেউ আইনি অভিবাসী, কেউ বেআইনি ... পাশাপাশি ইউরোপীয়/গ্রীক বাচ্চাদের সঙ্গে (বারো থেকে ষোলো বছর বয়সী ... তাদের সকলে, কখনও কোন স্কুলের ছাত্র, কখনও কোন এলাকার সকল ছাত্র নিজে থেকে গোটা পাড়ার দেখভাল করেছিল, অথবা কখনও একটা ছোটো শহরের কেন্দ্র ... তাদের সবাই কারোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়) ... এইসব যুবকে যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে তাতে এই দুনিয়ার খবরের কাগজগুলো প্রলাপ বকেছে যে, যদি দক্ষিণপন্থী সরকারের পতন ঘটে এবং তারা সম্মানিত বিনম্র বিজ্ঞানীদের ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যাখ্যা করতে বাধ্য করেছে, কর্তৃপক্ষের (প্রবীণ) সদস্যদের কী ঘটছে ...

বৃদ্ধদের সঙ্গে যুবক-যুবতীরা, বেকার ছেলে এবং বেসরকারি কোম্পানির শ্রমিকদের সঙ্গে নিজেদের খেয়ালে থাকা স্কুল-পালানো স্বশাসিত লোক যারা কাজ করতে চায় না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে তাদের সেইসব বন্ধু যারা মাসে ৫০০ বা ৭০০ ইউরোতে এমন সব কাজ করে যা তাদের কাছে ঘৃণ্য, এরাই ছিল একযোগে রাস্তার লড়াইয়ে,

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের নিষ্ক্রিয়তা, মূর্খতা আর পাগলামির বিরুদ্ধে ... তারা ছিল সেইসব মানুষ যারা নিজেদের জীবনকে ঘেন্না করে, গরিব বা বড়োলোক কোন তফাত নেই, এরা সকলে এমন এক ভাগ্যের ফেরে বাঁধা পড়তে অপছন্দ করে যা স্থির করে ডিম্বাকৃতি সরকারি অফিসের কিছু মূর্খ মোটা ভদ্রলোক ...

যদি তুমি অবাক হও, কারা গ্রীসের সমস্ত শহরে সমস্ত ব্যাঙ্ক আর দারুণ বিলাসবহুল ব্যবসা-কেন্দ্রগুলোকে জ্বালিয়ে আর গুঁড়িয়ে দিল, কারা দেশ জুড়ে এতগুলো পুলিশ স্টেশনে হামলা করল ... তোমাকে নিজের ঘরেই খুঁজে দেখতে হবে ... হয়তো তোমার ছেলে বা মেয়ে তাদের ঘরে বন্ধুদের সঙ্গে লুকিয়ে বসে মলোটভের বন্দোবস্ত করেছে, হয়তো তোমার বৌ টেলিফোনে উকিল আর রেডিও স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে আন্দোলনের সংহতির জন্য, হয়তো তোমার কাজের লোক, পিছনের ঘরে বসে সবকিছু শেষ করে দেওয়ার কথা বলেছে, হয়তো ওরা তোমারই বন্ধু, তুমি কখনও ভাবতেই পারোনি যে আচমকা রাস্তায়, এই উদ্‌যাপনের মাঝে এসে তোমার সঙ্গে মিলবে ...

আলেক্সিসের জন্য এই উদ্‌যাপন, আমাদের সমস্ত স্বপ্নের মতোই হঠাৎ সত্য হয়ে উঠল, সেই মৃত্যুর মুহূর্ত যা আকাশের গায়ে এক নতুন তারার মতো দিগন্তে ঝলসিয়ে উঠল ... এই শিশুর দেহে ধ্বংসের কত বিস্ময়কর স্বপ্নই না লুকানো ছিল, যখন পুলিশের গুলিটা বের করার জন্য ওর বুকটা চিরে ফেলা হল, সমস্ত স্বপ্নগুলোই কি বেরিয়ে এল রাস্তায় আর পুরনো পৃথিবীটাকে ধ্বংস করল? ... কত স্বপ্ন আলেক্সিসের হৃদয়ে লুকানো ছিল যে, মৃত্যুর মুহূর্তে তা সারা দেশে একটা আগুনের বলয়ের মতো ছড়িয়ে পড়ে পথের মাঝে সমস্ত বাধাকে চুরমার করে দিল?

তুমি শহরগুলোতে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের আগুনের ধোঁয়া দেখতে পারতে ... আগুন আমাদের রোজকার স্বাভাবিক জীবনের সমস্ত ঘৃণ্য জিনিসগুলোকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল ... সম্ভ্রান্ত বিখ্যাত মেগা-স্টোর, ব্যাঙ্ক, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, মন্ত্রীদের দপ্তর, মিউনিসিপ্যালিটি, ট্যাক্স সংগ্রহের অফিস, পুলিশ স্টেশন, ভদ্রলোকের আমোদের এলাকা, বিলাসবহুল হোটেল আর রেস্টুরেন্ট, গ্যালারি, মিউজিয়াম, সুপার মার্কেট, প্রাইভেট কার, টিভি স্টেশন, অফিস-বাড়ি ...

আর তারপর সমস্ত সমাজ ভালোই এখন জানে ... সময় আসছে, যা ঘটল তা হল শুধু এক প্রথম প্রকাশ্য দৃষ্টান্ত ... হয়তো এটা আমাদের অনেক অনেক বছর টেনে নিয়ে যাবে, হয়তো তা যে কোন মুহূর্তেই ঘটবে ...

কিন্তু এখন সমাজ জানে, যখন জনসাধারণ মুক্ত আর সমান হওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে, এই গ্রহের শহরগুলোর রাস্তায় রাস্তায় মাত্র কয়েক সপ্তাহের পরমানন্দ আগুন-উদ্‌যাপনেই সমস্ত ভদ্রলোক আর দাদাদের নিশ্চিহ্ন করা যাবে আর আমাদের জীবন ও পৃথিবী গ্রহটাকে পুঁজিবাদী মূর্খামির হাত থেকে রক্ষা করা যাবে ... যখন আমরা লড়ি, আমরা আলেক্সিসের সমস্ত স্বপ্নের জন্য লড়ি, আর আমরা সেই পনেরো বছরের ছেলেটার মতো একই সাহস নিয়ে লড়ি, যে এক নাৎসি সুপার যন্ত্রমানব খুনের সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল : ফোটো! আমরাই জিতছি!

আমরা নিশ্চিত, কেবল ভদ্রলোকেদের মহান অর্থনৈতিক ও কর্তৃত্ববাদী স্বার্থরক্ষার জন্যই চারদিনে গণতন্ত্র একনায়কতন্ত্রে পাল্টে যেতে পারে ... "প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র" হল আভিজাত্যেরই অন্য এক নাম, আর একনায়কতন্ত্র হল বিপ্লবের মুখে দাঁড়িয়ে সমস্ত "গণতান্ত্রিক প্রতিনিধি"-দের কেটে বেরোনোর পরিকল্পনা ..., সকলেই এখন তা জানে ... আমাদের জীবন আর গ্রহটাকে রক্ষা করতে যে কোন উদ্যোগে আমাদের পুলিশের মোকাবিলা করতে হবে, এব্যাপারে আমাদের নিশ্চিত হওয়া দরকার ... কিন্তু পুলিশ কয়েক সপ্তাহের বেশি রাস্তাগুলোতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, যখন সকলে উদ্‌যাপনে অংশ নেয় ...

আর তারপর ওরা আমাদের সকলকে মেরে ফেলার জন্য সেনা তলব করার চেষ্টা করে ... কিন্তু তুমি কি সত্যিই মেশিনগান দিয়ে একটা স্বপ্নকে হত্যা করতে পারো? আর ... তুমি কি সেনাবাহিনীতে আমাদের সব বন্ধুকে আমাদের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিতে পারো? এই কর্তৃপক্ষের কি সেই সাংস্কৃতিক প্রভাব রয়েছে, যা খাটিয়ে তারা সমস্ত যুবক-সেনাকে আমাদের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য করতে পারে? আমরা মনে করি, ওই মূর্খ গভর্নর আর লিমুজিনে চেপে ঘুরে বেড়ানো তাদের মোটাসোটা ধনী বন্ধুদের রক্ষা করার জন্য নিজেদের বন্ধুদের হত্যা করার চেয়ে সেনারা রাস্তার ওপর উচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়া এক বিপ্লবী আমোদপূর্ণ ভোজসভা আর লুঠ ও আগুন জ্বালানো রাতগুলোকে বেশি পছন্দ করবে ...

আমরা জিতছি! ... আর যখন আলেক্সিস পুলিশটার সামনে দাঁড়িয়েছিল, আমাদের সকলকে ও দেখিয়ে দিয়েছিল যে আমাদের এটা নিজেদের জোরেই করতে হবে, যেমনটা ও করেছিল! ... ক্ষমতার উচ্চাসনকে নাকচ করতে, কর্তৃত্বকে নিকেশ করতে, জাতীয়তাবাদ-বর্ণবাদী-যৌনবাদী-পৌরুষ জাহির করার মনোভাবকে ধ্বংস করতে, মিডিয়াকে বিশ্বাস না করতে, সামাজিক স্বাভাবিকতাকে না মেনে চলতে, ফ্যাসিস্ট-বিরোধী হতে, কাজের পুঁজিবাদী ব্ল্যাকমেলের কাছে আত্মসমর্পণ না করতে, ব্যাঙ্কঋণ ফেরত না দিতে, আমাদের নিজেদের বিচ্ছিন্ন নীরব আর ভয়ের মধ্যে না রাখতে ... আমরা এটা করতে পারি ... আমরা পাল্টা লড়তে পারি ... আর যদি সমস্ত সমাজ একদিন উঠে দাঁড়ানোর সাহস করতে পারে ... তখন ... আমাদের সব স্বপ্ন আর প্রত্যেকের সমস্ত আশা আলেক্সিসের হাসির মতোই আকাশে উঠে দাঁড়াবে ... যা ছিল খোলামেলা, উষ্ণ আর সর্বাঙ্গীণ ...

আমাদের গোপন স্বপ্নের ভিতর লুকিয়ে থাকা পৃথিবীগুলো "বাস্তব" পৃথিবীর চেয়েও অনেক বেশি বাস্তব।

চেনাজানা পৃথিবীর ভস্মস্তূপের ভিতর থেকে আমাদের পৃথিবীগুলো উঠে দাঁড়াবে, এক ফোঁটা চোখের জলের ভিতর থেকে একটা ফুটন্ত ফুলের মতোই।

মন্থন সাময়িকী'র গ্রাহক হ'ন

ডাকযোগে এক বছরে ছ'টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা পঞ্চাশ টাকা।

যোগাযোগ : জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, ডাক: বড়তলা, কলকাতা ১৮, দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : jiten_nandi@vsnl.net

নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের দখলে

২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররা দখল করে নিয়েছে। তারা কিমেল বিল্ডিং দখল করে নিয়েছে। ওই বিল্ডিংয়ে যেসব ছাত্র কাজ করে তারা বাদে কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এই খবর পাঠায় 'টেক ব্যাক এনওয়াইইউ' নামে এক ছাত্র সংগঠন।

এরপর খবর আসে :

আমরা নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছাত্ররা, যেসব ছাত্র নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে রেখেছে, তাদের পক্ষ থেকে বলছি। দখলকারী ছাত্রদের নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিমেল বিল্ডিং এর ইন্টারনেটে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এইভাবে খবরগুলো যাতে সহজে ছড়িয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করে কর্তৃপক্ষ আবার বুঝিয়ে দিয়েছে যে ছাত্রদের সাথে খোলামেলা আলোচনা চালাতে তারা অপারগ।

কেন প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয় বিল্ডিং দখল করা হল তা এখন সহজেই বোঝা যাচ্ছে। এনওয়াইইউ তার সাধারণ অস্বচ্ছতার সাথে ধারাবাহিকভাবেই আলাপ-আলোচনাকে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। আমাদের দাবিসনদের চেহারাটা দেখলেই বোঝা যাবে ঠিক কী বিশাল সংখ্যক মানুষের কথা কর্তৃপক্ষ শুনতে চায় না।

কিন্তু ছাত্ররা নিজেদের কথা শোনাতে বদ্ধপরিকর। আমরা সবাই তাদের সঙ্গে আছি।

দখল চলতে থাকুক, আগে আমরা দেখে নিই ছাত্রদের দাবিগুলি কী কী?

ছাত্র হিসেবে আমরা যারা এনওয়াইইউ-কে একটা প্রগতিশীল, সম্মানীয় আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে মনে করি, তারা 'টেক ব্যাক এনওয়াইইউ'-এর পক্ষ থেকে দাবি করছি, প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র ও পরিষ্কার হিসেব-নিকেশ দেওয়ার যে দায়বদ্ধতা এনওয়াইইউ-এর আছে তাকে সুনিশ্চিত করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে :

১) এনওয়াইইউ বোর্ড অফ ট্রাস্টি মিটিংয়ে ছাত্রদের মধ্যে থেকে একজন নির্বাচিত প্রতিনিধিকে রাখতে হবে এবং তাকে অন্যান্য সদস্যদের সমান ক্ষমতা দিতে হবে।

২) এনওয়াইইউ-এর বার্ষিক বাজেট জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। এই বাজেটের অন্তর্গত বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ, মাইনে, কন্ট্রাক্ট ও কনস্ট্রাকশনের খরচ, স্কুল ও বিভাগগুলিতে নিয়োগের হিসেবের সাথে সাথে আয়ের সমস্ত রকম উৎসের সাথে সম্পূর্ণ তালিকা দেখাতে হবে।

৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি, বিনিয়োগের নীতি, সম্পদ উন্নয়নের পরিকল্পনা, যেসব ব্যক্তি, কর্পোরেশন ও ফার্ম বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা খরচ করছে তাদের নাম এবং সাথে সাথে সব ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীর তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

৪) আমরা বিশ্বাস করি যে হিসেব দাখিল করা ও স্বচ্ছতার এই সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি এমন একটা বিশ্বাস গড়ে তুলবে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে আরো অর্থ পুনর্নিয়োগ করতে অ্যালামনি সদস্যদের উৎসাহিত করবে। একইভাবে ছাত্রদের ক্ষমতাদানের মধ্যে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের উদ্যোগকে উজ্জীবিত করতে পারবে এবং এনওয়াইইউ-এর গৌরব বাড়াতে পারবে।

ছাত্রদের এই দাবিগুলি কেন উঠে এসেছে সে ব্যাপারে তারা বলছে — কেন এনওয়াইইউ-এর বাজেট ও সম্পদের পরিমাণ প্রকাশ্যে আনা উচিত — তার দশটা প্রধান কারণ হল :

১) পড়ানোর খরচ বাড়ছে : মাইনে বাড়ছে মুদ্রাস্ফীতির থেকেও বেশি হারে। কেন? এটা আমাদের জানা দরকার।

২) পরিবেশ-সহনশীলতা : এনওয়াইইউ কীভাবে টাকা খরচ করছে তার প্রভাব পরিবেশের ওপরেও পড়ে।

৩) লিঙ্গভেদ ও জাতভেদ : কর্মচারীদের মাইনের [লিঙ্গ ও জাতগত] তারতম্যকে গোপনীয়তা সুরক্ষিত রেখেছে।

৪) গণহত্যা ও যুদ্ধব্যবসা থেকে লাভ : আমরা নিশ্চিত হতে চাই যে এনওয়াইইউ-এর সম্পদ এমন কোনও কোম্পানি ব্যবহার করছে না যারা যুদ্ধ লাগায় ও গণহত্যা করে।

৫) ন্যায্য মজুরি : প্রত্যেক এন ওয়াই ইউ কর্মচারীর জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় মজুরি পাওয়া উচিত। আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে চাই যে তারা তা পাচ্ছে।

৬) প্রাণী গবেষণা : ছাত্রদের জানার অধিকার আছে যে তাদের মাইনের টাকায় গবেষণার নামে কোনও প্রাণীর ওপর নিষ্ঠুরতা হচ্ছে কি না?

৭) আর্থিক সহায়তা : সহায়তার নামে শোষণ চলছে কিনা।

৮) বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ : আমাদের মাইনের টাকাতে বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। আমাদের জানার অধিকার আছে যে এই টাকাগুলি যে দিচ্ছি সেগুলো আশেপাশের অধিবাসীদের কোনও ক্ষতি করছে কি না।

৯) আবু ধাবি : এনওয়াইইউ আবুধাবি শাখার একটি বিপজ্জনক বিনিয়োগ চলছে। এবং ওখানে যে সরকার ওটা নির্মাণের কাজ চালাচ্ছে সেই সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘন করার কথা সর্বজনবিদিত।

১০) দুর্নীতি : যারা কিছু লুকোতে চায়, গোপনীয়তা তাদের রক্ষা করে।

স্বাক্ষর : (সোমবার,২০ নভেম্বর ২০০৮) ...

সাক্ষরিত গোষ্ঠীগুলোর ঐক্যের সূত্র হল :

- আমরা কাজ করছি এইসব দাবিগুলো আদায়ের জন্য : বাজেট প্রকাশ করা, সম্পত্তির পরিমাণ প্রকাশ করা ও একজন ছাত্রকে বোর্ড অফ ট্রাস্টিতে নেওয়া
- সমস্ত রকম সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী টেক ব্যাক এনওয়াইইউ-এর সাধারণ সদস্যদের সামনে সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে। সর্বসম্মতিতে না পৌঁছতে পারলে, কোনও গোষ্ঠী এককভাবে কর্মসূচী নিতে পারে, কিন্তু তারা এই মোর্চার নাম ব্যবহার করতে পারবে না।
- টেক ব্যাক এনওয়াইইউ হচ্ছে একটা তারতম্যবিরোধী, নিপীড়ন বিরোধী, লিঙ্গবিদ্বেষ বিরোধী, জাতভেদ বিরোধী, প্রশ্ন-বন্ধু (অর্থাৎ যে কোনও প্রশ্ন তোলা যেতে পারে এমন) সংগঠন।
- আমাদের সদস্য গোষ্ঠীগুলির নানাবিধ কৌশল প্রয়োগের অধিকারকে আমরা মানি ও উৎসাহিত করি, যদি ওই কৌশলগুলি আমাদের পূর্বনির্ধারিত ঐক্যসূত্রগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। টেক ব্যাক এনওয়াইইউ-এর দাবিগুলির সাথে সহমত হওয়া মানে এই নয় যে মোর্চার সদস্য গোষ্ঠীগুলির বিশেষ কৌশলগুলির সাথে সহমত হওয়া।
- আমরা বিশ্বাস করি যে এই দাবিগুলি আরও স্বচ্ছ, হিসাব পেশে দায়িত্ববান ও গণতান্ত্রিক এনওয়াইইউ সম্প্রদায় গড়ে তুলবে।

ছাত্রদের দাবিগুলো দেখা হল। আবার আমরা দখলের প্রশ্নে ফিরে যাই —

২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ রাত তিনটে : আমরা এনওয়াইইউয়ের ভেতর থেকে লিখছি। বিল্ডিংয়ের বাইরে শতশত মানুষের ঢেউ, ওরা নাচছে। দারুণ উৎসাহ। আমরা তা ধরে রাখতে চাই।

আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে কর্তৃপক্ষ বারবার শুধু দখল ছেড়ে দেওয়ার জন্য 'লাস্ট ওয়ার্নিং'-এর শাসানি দিচ্ছে। আর জানিয়েছে, যে সমস্ত ছাত্র দখলের সাথে যুক্ত তাদের সবাইকে খুঁজে বার করা হবে, এই দখলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে এবং ছাত্ররা তাদের দাবি নিয়ে আলোচনা করার জন্য দু'জন মাত্র প্রশাসকের সাথে কথা বলতে পারে।

অতএব ... মূলত তারা আমাদের কালো তালিকাভুক্ত করতে চাইছে। দখল অভিযানকে শেষ করে দিতে চাইছে। আমরা মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য একটা ঘরে লীনে ব্রাউন (বিশ্ববিদ্যালয়ের রিলেশন ও পাবলিক অ্যাফেয়ারের ভাইস প্রেসিডেন্ট) ও লিন্ডা মিলস্ (আন্ডারগ্র্যাজুয়েট এডুকেশন ও ইউনিভার্সিটি লাইফের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট)–এর সাথে কথা বলতে পেরেছি — যেটা কোনও আলাপ–আলোচনা নয়, ওরা শুধু হুকুম জারি করেছে, দরকষাকষির কোনও সুযোগই ছিল না।

জনতার উদ্যম প্রবল। কয়েকঘন্টা ধরে তারা 'ওয়েস্ট ফোর্থ স্ট্রীট' দখল করে রেখেছে। তারা রাস্তা জুড়ে নাচছে, চিৎকার করছে। একটা সময় কিমেল বিল্ডিংয়ের প্রবেশপথে পুলিশ ব্যারিকেডের সাথে জনতার ধাক্কাধাক্কি হয়েছে। একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে একজন অফিসারকে হেনস্থা করেছে। যদিও এটা সমর্থিত দাবি নয়।

আমরা ইন্টারনেট ব্লগিং ও ছাত্র জনতার দিকে হাত নাড়ানোর ব্যস্ততার মাঝে মাঝে একটু ঘুমিয়ে ও খেয়ে নিয়েছি। আমরা সকলের সমর্থনে খুশি, আমরা সবসময়েই আলোচনার রাস্তা খোলা রেখেছি। আমরা উপস্থিত সকলকে বলছি, তোমরা অধ্যাপক, প্রশাসক ও বাবা–মায়েদের সাথে যোগাযোগ করো। আমাদের একমাত্র দাবি, আলোচনার টেবিলে আমাদের জন্য একটা জায়গার। আলোচনার ব্যাপারে আমাদের অন্যকোনও দরাদরিই নেই। আমরা কথা বলার ব্যাপারে কোনও ওকালতি চাই না। শুধু আমাদের কথাগুলো শুনতে হবে।

এটা হচ্ছে সেই ছাত্রদের জন্য যারা তিনবেলা কাজ করে তাদের স্বপ্নের শিক্ষালয়ে উপস্থিত থাকার জন্য। এটা হচ্ছে গাজার সেই সব ছাত্রদের জন্য যাদের বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, যারা আর পড়তে পারে না। এটা হচ্ছে, আবুধাবিতে আমাদের বিল্ডিং গড়ে তুলছে যে সব শ্রমিকরা, যাদের কথাবলার কোনও মানবিক অধিকার নেই, তাদের জন্য। আমাদের এটা একটা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের কাজের সাথে পৃথিবীর নানা ঘটনার সম্পর্ক আছে, সে আমরা পছন্দ করি বা না করি। এটা আমাদের দায়িত্ব। এই আমাদের কথা। ওরা এগুলো শুনে ব্যবস্থা নিক।

একের পর এক খবর আসে :

● দখল করা অংশে সবরকম শক্তি সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যদিও আলো এখনো জ্বলছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ আবার নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত, যেসব ছাত্র ভেতরে আছে তাদের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই।

● পুলিশ জনতার ভিড়ে লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়েছে, ফলে রাস্তায় কয়েকজন সমর্থক অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তবুও চারশো থেকে পাঁচশোজন এখনও রয়েছে এবং তারা ফিরে যাবে বলেও মনে হচ্ছে না। আমরা যে ছাত্ররা দখল করছি, তারা দৃঢ়ভাবেই যে কোনও হিংস্র পদক্ষেপের বিরুদ্ধে এবং আমরা আশা করব বাইরের ছাত্রজনতাও অহিংস পদ্ধতিতেই আমাদের সমর্থন করবে। আলাপ–আলোচনা চলছে, আমরা আমাদের সমস্ত সমর্থনকারীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

● এনওয়াইইউ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিখ্যাত বিভাগীয় প্রধান লিখিতভাবে বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন তিনি কিমেল সেন্টার দখলকারী ছাত্রদের সমর্থন করছেন এবং ওই বিভাগের বেশিরভাগ শিক্ষকের সমর্থনই দখলের শুরু থেকেই ছাত্ররা পাচ্ছে।

● হেলসিঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এনওয়াইইউ–এর দখলকারী ছাত্রদের সমর্থন জানানো হয়েছে এবং এখানকার ছাত্রদের দাবিগুলোর অনেকগুলির সাথে তাদের ওখানকার দাবির যে মিল রয়েছে, সে কথা জানিয়েছে। ডিসি (ওয়াশিংটন) বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও ছাত্ররা সমর্থন জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে এবং তারা তাদের ক্যাম্পাসে ছাত্রদের গণতন্ত্রের দাবিতে লড়াই চালাচ্ছে।

● স্পেনে যে ছাত্ররা বার্সিলোনা বিশ্ববিদ্যালয় তিন মাস ধরে দখল রেখেছে তারা চিঠি লিখেছে — হে বিজয়ী, নিউইয়র্কের ছাত্ররা যে নিজেদের অধিকারের জন্য এবং আরো সুন্দর এক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রুখে দাঁড়িয়েছে তা জেনে আমরা খুবই আনন্দিত হয়েছি। কুখ্যাত 'বোলোনা পদ্ধতি'র মাধ্যমে, স্পেনে ও ইউরোপে উচ্চশিক্ষাকে যে বাণিজ্যিকীকরণ ও ক্রমাগত ব্যক্তি মালিকানাধীন করে তোলা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ গত তিনমাস ধরে আমরা বার্সিলোনা বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে রেখেছি। আমরা আশা করি তোমাদের দখল অভিযান সফল হয়েছে এবং তোমরা যারা এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছো তাদের চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। তোমাদের এই কাজ, পৃথিবীজুড়ে পুঁজিবাদ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সাধারণ যুবজনতার যে লড়াই তার শক্তি সম্পর্কে আমাদের আশা জাগাচ্ছে। আমরা তোমাদের সাথে ইমেল–এ যোগাযোগ রাখতে পারব এবং আশা করব 'আন্তর্জাতিক ছাত্র আন্দোলন' যে অ্যাকশন ২০০৯–এর বিশ্ব সপ্তাহ পালন করতে চলেছে সেই মঞ্চ থেকেও তোমাদের সাথে যোগাযোগ হবে। নিচে আন্তর্জাতিক কমিশন গঠনের জন্য আহ্বান জানানো হ'ল। 'নব্য বৌদ্ধিক অভ্যুত্থানের জন্য আন্তর্জাতিক কমিশন গঠন করো' ...

● গ্রীসের ছাত্ররা এথেন্স থেকে চিঠি লিখেছে — নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের বোন ও ভাইয়েদেরকে, তোমাদের কাজকে আমরা সংহতি জানাচ্ছি। জেনে নাও তোমাদের সকলের জন্য আমরা এখানে লড়ব যেমন ওখানে তোমরা আমাদের জন্য লড়ছো ... আমরা সুখী যে তোমরা তোমাদের সময় ও পরিসর মুক্ত করতে পারো, মানুষ হিসেবে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে তোমরা তোমাদের মৌলিক অধিকার ছিনিয়ে নেবার জন্য সংগ্রাম করতে পারো ... যেহেতু তোমরা পুঁজিতন্ত্রী বৃহৎ যন্ত্রের পেটের মধ্যিখানে রয়েছো, যেহেতু এই গ্রহকে যারা দূষিত করছে, যারা এই পৃথিবীর সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছে সেই অভিজাতদের কালো অন্ধকারের কেন্দ্রে তোমরা লড়াই করছো, যেহেতু তোমরা লড়াই করছো সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে... তোমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা বিভিন্ন দেশের মানুষ, ভিন্ন ভিন্ন কর্মস্থল, স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই গ্রহের পথে বেরিয়ে এসেছি তোমাদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে ... তোমাদের উদ্যমকে সোৎসাহে উজ্জীবিত রাখো! ... যখনই আমরা কোনও কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে নিজেদের প্রকাশ করি, যখনই আমাদের পদক্ষেপগুলি মানুষের নজরের মধ্যে আসে, তখনই পৃথিবীর সর্বত্র হাজার হাজার নতুন সঙ্গী আমাদের পক্ষে চলে আসে, সম্মিলিত মন থেকে হাজারো নতুন চিন্তা আমাদের নগরের পথে নেমে আসে।

লড়াই চালিয়ে যাও। আমরা জিতছি!

দখলের শেষ আর দখলে যা রয়ে গেল

চল্লিশ ঘন্টা ধরে এই দখল অভিযান চালানোর পরে ২১ ফেব্রুয়ারি দুপুর দুটোর সময় 'টেক ব্যাক এনওয়াইইউ'–এর সদস্যরা কিমেল সেন্টার ছেড়ে চলে যায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক জীবন শুরু হয়। এই ঘটনা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা হিসেবে ছড়িয়ে যায়, ছাত্ররা দেখিয়ে যায় দুনিয়াজোড়া নয়া ছাত্র আন্দোলনের আসল শক্তি কতটা। দখলকারী ছাত্ররা জানাচ্ছে — সন্দেহ নেই যে এনওয়াইইউ কর্তৃপক্ষ শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু কোনও ছাঁটাই, বহিষ্কার বা গ্রেপ্তারি দিয়ে আটকে রাখা যাবে না গত দুদিনে যার শুরু হয়েছে। যারা দখল করে ভেতরে থেকে গিয়েছিল আর যারা বাইরে থেকে সমর্থন করেছিল সেই শত শত ছাত্রের

হাত ধরে এই আন্দোলন এগিয়ে যাবে। গোপনীয়তাকে রক্ষা করার অযৌক্তিক প্রয়োজন আর ক্ষমতাকে কুক্ষিগত রাখার যে প্রদর্শন এনওয়াইইউ কর্তৃপক্ষ চালিয়ে যাচ্ছে সেটাই হবে এই আন্দোলনের চালিকা শক্তি।

যারা সমর্থন জানিয়েছে তাদের প্রত্যেকের জন্য বলব : এই ঘটনার প্রকৃত শিক্ষা হল তোমরাও কিছু করতে পারো, তোমরাও পার্থক্য টানতে পারো। এই দখলের শিক্ষাকে তোমাদের লড়াইয়ে প্রয়োগ করো। তোমরা তোমাদের মতো করে এগিয়ে যাও, সামনের দিকে।

দখল অভিযানের শেষদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের অসৎ আচরণের একটা বড়ো দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দখলকারী ছাত্রদের পাঁচজনকে ডাকা হয়েছিল লীনে ব্রাউনের সাথে মীমাংসা আলোচনায়, কিন্তু তারা যখন ব্যারিকেড টপকে স্বেচ্ছায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে যায় তখন বিশ্ববিদ্যালয় রক্ষীবাহিনীর একজন তাদের এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে হাতে বহিষ্কারের কাগজ ধরিয়ে দেয়। কোনও আলোচনাই করা হয় না।

অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় শেষে দেখিয়ে দিল কেন আমাদের এই দখলের মতো আরও অনেক কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। ...

২১ ফেব্রুয়ারি আরেক খবরে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার যে ছাত্রদরদী ছবি জনমানসে রয়ে গেছে সেসবের ক্ষতিস্বীকার করেও বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ঠিক এই মুহূর্তে বেশ কিছু প্রতিবাদীকে তাদের হোস্টেলের ঘর থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে। এটা ঠিক নয়। অসন্তোষের জন্য কাউকে গৃহহারা করা উচিত নয়। দয়া করে এনওয়াইইউ হাউজিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনারা চাপ তৈরি করুন যাতে ছাত্রদেরকে তাদের ডর্মিটরিতে থাকতে দেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে দখলকারীদের হঠিয়ে দেওয়ার সময়ে লেখা স্কট ক্যাম্পবেলের একটা চিঠি দিয়ে শেষ করব।

আজকে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে বেশি করে তার সত্যিকারের মুখটা দেখিয়েছে। যদিও এরা নিজেদেরকে 'পাবলিক বা জনগণের সেবায় একটা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়' বলে দাবি করে, এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এরা এমনকী সেইসব ছাত্রদেরও সেবা করে না, যাদের মাইনের টাকাতেই এরা বেঁচে আছে।

আজ সকালের দিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দখলীকৃত অংশের সবজায়গায় শক্তি সরবরাহ ও ইন্টারনেট যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। অবশ্যই এটা করা হয়েছিল দখলদারদের চুপ করিয়ে দেওয়ার ও ভয় দেখানোর জন্য — কারণ ওরা বাইরের থেকে অনেক সমর্থন আদায় করে ফেলছিল। তারপর কর্তৃপক্ষ জানালো তারা আলোচনা করবে এবং তাদের কথায় ভরসা করে ছাত্ররা যখন মীমাংসা করতে বেরিয়ে এল তখন তাদের আটক ও ছাঁটাই করল। বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষীবাহিনী এখন ব্যারিকেড ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়েছে, তারা ছাত্রদের ধরছে আর ছাঁটাই করছে।

কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনার বদলে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসকরা যে জোর খাটানো ও অসন্তোষ নিশ্চিহ্ন করার একনায়কতন্ত্রী পথই পছন্দ করে তা বুঝিয়ে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে চলছে এটা তার বাস্তব প্রতিফলন। এরা হল স্যুট টাই পরা কিছু গলাকাটার দল যারা 'শিক্ষা'র ছদ্মবেশে ধন আহরণ করতে চায়, তাছাড়া আর কিছুই না।

যারা দখলকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল তাদেরকে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগতভাবে কিছুতেই যাতে আইনত বা শিক্ষাক্ষেত্রে শিকার করা না হয়, সেই ব্যাপারে প্রস্তুত থাকো। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই বেমানান ও লুঠেরার মতো আচরণ কিছুতেই দখল অভিযান এবং তার দাবিদাওয়াগুলো যে ব্যাপক সমর্থন অর্জন করেছিলো তাকে ধ্বংশ করতে পারবে না।

৬০, দক্ষিণ ওয়াশিংটন স্কোয়ারে এসো, যদি পারো।

চিঠিপত্র / বিষয় : সম্পাদকীয় / আমার জ্বলেনি আলো ... ২৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ

প্রায় একই পংক্তিভূক্ত হয়ে যায়। আলাদা হতে গেলে চিন্তনের পার্থক্য থাকা দরকার। পরমাণু বিদ্যুৎ নয়, পরিবেশ-বান্ধব সৌরশক্তি বা অন্য কিছুর পক্ষে সওয়াল করলে তাঁদের প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করছেন বলা যেত। কেননা আমেরিকা নিজের দেশে পরমাণু চুল্লি বাতিল করে সেই বাতিল প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি তৃতীয় বিশ্বে বেচতে চাইছে — যার অন্যতম খরিদ্দার ভারতবর্ষ। তাই পরমাণু বিদ্যুতের পক্ষে গান গাওয়া পরমাণু চুক্তিকে সমর্থন করার একটি ধাপ মাত্র, পরমাণু দাসত্বের শামিল।

পরিশেষে বিতর্কে ইন্ধন জোগানোর জন্য একটি কথা বলা যায় — ক্ষমতার ভাষা ব্যবহার করা হোমো সেপিয়েন্স অর্থাৎ মানুষের ধর্ম। প্রত্যেকটি জীব, উদ্ভিদ, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা, সমুদ্র মানুষের উপকার করে। মানবেতররা প্রকৃতি থকে প্রয়োজন-অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে না। মানুষ তার লোভ মেটাতে বিজ্ঞানের তথাকথিত প্রযুক্তিকে সম্বল করে প্রতিনিয়ত প্রকৃতি-নিধনযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে যত মারণাস্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, তত জীবনদায়ী ওষুধ (ক্যানসার, এইচআইভি, এডসের ওষুধ) আবিষ্কার হয়নি। এই ধ্বংসকাণ্ডে জড়িয়ে আছে একদল মানুষ। তারা অন্য কৌমের মানুষকে তাড়িয়ে দিয়ে তথাকথিত সভ্যতার উলঙ্গ রূপ বের করেছে। অত্যন্ত দুঃখের হলেও, রাশিয়া বা চীন প্রভৃতি তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অবদানও এতে কম নয়।

সোভিয়েতের অবর্তমানে আমেরিকার রমরমা। আমেরিকা সারা বিশ্বজুড়ে দাদাগিরি করছে। আবার এই প্রভুর পদসেবায় নিযুক্ত রাষ্ট্রগুলো তাদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে, হত্যা করছে, উচ্ছেদ করছে ঢপের উন্নয়নের নামে! ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যের 'অপর' জনগণের ওপর রাষ্ট্রের বর্বর আক্রমণের কথা অবর্ণনীয়।

তাই বন্ধু, যদি অন্য দুনিয়া কোনদিন সম্ভব হয়, তাহলে 'অপর'-কে ধ্বংস করার প্রবৃত্তি ত্যাগ করতে হবে। তা নাহলে এক ক্ষমতাধর গোষ্ঠীর বদলে আরেক ক্ষমতাধর গোষ্ঠীর উদ্ভব হবে এইমাত্র। পূর্বের সোভিয়েত রাশিয়া বা আজকের চিন আমাদের এই শিক্ষাই দিচ্ছে বলে আমার মনে হয়।

ধন্যবাদান্তে

১৬ জানুয়ারি ২০০৯

রাহুল মিত্র
ব্যারাকপুর

সংকটে বিশ্বায়ন

শমীক সরকার
শুভাশিস চক্রবর্তী

গত শতাব্দীর শেষ দশকের সূচনা থেকেই ব্যবসার দুনিয়া নব সাজে সেজে ওঠে। নতুন নতুন শিল্পক্ষেত্র গড়ে উঠতে থাকে। সেই সঙ্গে শিল্পও পালটে যেতে থাকে। বিভিন্ন দেশ তাদের আইনকানুনের পরিবর্তনের মাধ্যমে এর সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেয়। ২০০০–২০০১ সাল নাগাদ এই নবসজ্জায় কিছুটা ধাক্কা আসে। তার একটি কারণ, এই নবসজ্জা দাঁড়িয়েছিল ভোক্তার যে পরিমাণ টাকা খরচের ওপর, সেই পরিমাণ টাকা খরচ ২০০১–এর ১১ সেপ্টেম্বরের পর বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো ভোক্তা মার্কিন জনগণ কিছুদিনের জন্য বন্ধ করে দেয়। কেনার সেই অরুচি দূর করতে ব্যাঙ্কের ইন্টারেস্ট রেট ভীষণ কমিয়ে দেওয়া হয়। ক্যাশ টাকা নেই তো কী, ধার করে ঘি খাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্ত করা হয়। আবার খাঁই বাড়ে মার্কিন ক্রেতা তথা দুনিয়ার যত মার্কিন ক্রেতার তুল্য হয়ে উঠতে চাওয়া মানুষের। কাল বাদে পরশু তা কত বাড়তে পারে সেইসব হিসেবনিকেশ করতে করতেই এই খাঁই মেটাতে প্রায় সারা বিশ্ব হরেক মালের পসরা সাজিয়ে বসতে চায়। আজকের বিক্রির জন্য তো বটেই, কালকেও যাতে বিকিকিনির হাটে 'এক নম্বর' হয়ে ওঠা যায় তার জন্য আজ রাতের মধ্যেই মালটা বানিয়ে বসে থাকা। কিন্তু ধার করে ঘি খাওয়ার তো একটা শেষ থাকে, বিশেষত ধার শোধের ক্ষমতা নেই এরকম লোকেও যদি এসব করতে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যেটা কেনা হয়েছে, সেটাই বন্ধক রাখা হয়েছে। বন্ধকী জিনিসটি কব্জা করার জন্য পাওনাদার হাত বাড়ায়। আস্তে আস্তে বন্ধকী জিনিসটি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যেটা গাড়ি কিম্বা বাড়ি, তার দাম কমে যাওয়ায় পাওনাদারের পাওনা উশুল হয় না। মহাজনেরা দেউলে হয়ে যেতে শুরু করে। আর ক্রেতারা ধীর কিন্তু নিশ্চিত পদক্ষেপে কেনাকাটা কমিয়ে দিতে থাকে। এ বছরের গোড়ার দিক থেকে মার্কিন সরকারি রিপোর্টে অনুযোগ করা হতে শুরু হয়, যারা চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়ে স্বেচ্ছাবসরমূলক এককালীন কাঁড়ি কাঁড়ি ডলার পেয়েছে, তারা সেই অনুপাতে খরচা করছে না। তারা 'সহযোগিতা' করছে না মার্কিন সরকারের সঙ্গে। বিশ্বায়নের বাঁদিকের তাত্ত্বিকরা, স্টিগলিজ থেকে শুরু করে অমর্ত্য সেন, বলতে থাকেন, ক্রেতাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। আগ বাড়িয়ে অমর্ত্য সেন বলে দেন, সংকট নিয়ে বেশি হইচই দরকার নেই। তাতে যে 'অনাস্থা' বাড়ে!

এই পরিপ্রেক্ষিতে, হাল ফেরানোর দাওয়াই নিয়ে নতুন শিল্পায়নের দূত হিসেবে যেসব শিল্পকে একসময় চেনা গিয়েছিল, তাদের কয়েকটির দিকে একটু নজর দেওয়া যাক।

রিয়েল এস্টেট : দুবাই

দুবাইয়ে রিয়েল এস্টেট 'বুম' ২০০২ থেকে। দুবাই ২০০২ সালে বিদেশি ক্রেতাদের জন্য রিয়েল এস্টেট সেক্টর খুলে দেয়। তারপর এখানে রিয়েল এস্টেট শিল্পে জোয়ার আসে। আমিরশাহীর অর্থনীতির ৩০ শতাংশ কেবল এই রিয়েল এস্টেট সেক্টরের। এই রিয়েল এস্টেট সেক্টরের সঙ্গে জুড়ে আছে পর্যটন। ২০০৭ সালে দুবাইয়ে কেবল ব্রিটিশ টুরিস্টই এসেছিল ৮ লাখ। দুবাইয়ে আছে বার্জ দুবাই নামক পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা বাড়ি; আছে বিশ্বের বৃহত্তম মল। এখানে একটা দ্বীপে আছে, পাম দুবাই, সেটা বানানো দ্বীপ। পাম গাছের মতো দেখতে। সেখানে একটা হোটেল করা হয়েছে, আটলান্টিস।

গত বছরটা জুড়েই দুবাইয়ের রিয়েল এস্টেট বুম নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। দুর্নীতির দায়ে অনেক শিল্পপতি প্রশ্নের মুখে পড়ে, এমনকী গ্রেপ্তার হয়। একটি ইউরোপীয় সংস্থার তদন্তে ধরা পড়ে, হোটেল প্রভৃতির বর্জ্য ফেলা হচ্ছে ম্যানহোলে আর সেই ম্যানহোলের থেকে বর্জ্য সোজা গিয়ে পড়ে সমুদ্রে। সরকার বাধ্য হয় বেশ কিছু বিচ দূষণাক্রান্ত বলে বন্ধ করে দিতে। কুয়েত স্টক এক্সচেঞ্জে কুয়েতি রিয়েল এস্টেট ইনডেক্স কমে যায়। ২০০৭–এ যা ছিল ৪ বিলিয়ন কুয়েতি ডলার, ২০০৯ সালের প্রথমে তা দাঁড়ায় ২.৬ বিলিয়ন কুয়েতি ডলার। মার্কিন মহাজনি ব্যাঙ্কগুলোর মতো কাছাখোলা ধারের কারবারে যাতে এই দেশের ব্যাঙ্কগুলো জড়িয়ে না পড়ে, তার জন্য কুয়েত সরকার ২০০৮–এর ফেব্রুয়ারিতে একটা আইন ঘোষণা করে (আইন ৮ এবং ৯)। এই আইন বলে নিষিদ্ধ হয় ব্যক্তিগত কোম্পানি ও কর্পোরেশনের সম্পত্তি কেনা–বেচা এবং সম্পত্তি মর্টগেজ করা। আবাসনকে ঋণ দেওয়া বন্ধ করতে বলে সমস্ত ইসলামি ব্যাঙ্কগুলিকে।

২০০৮ সালের শেষের দিকে আটলান্টিস হোটেল উদ্বোধনের পরেই একটা খবর চাউর হয়, এখানে নাকি নির্ধারিত দামের ১০ শতাংশে ঘর ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে। কারণ বুকিং হচ্ছে না। সরকারি ডেভেলপার 'নাখিল' ২০০৮–এর ডিসেম্বরে ৫০০ কর্মী কমিয়েছে। এই নাখিল–ই আটলান্টিস হোটেলের মূল কারিগর। এরা একটি হোটেল এবং দুটি দ্বীপ তৈরি করার চলতি কাজের গতি কমিয়ে দিয়েছে। দুবাইয়ের রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটির চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মারওয়ান বিন ঘলিতা জানাচ্ছেন, সম্পত্তি ডেভেলপারের সংখ্যা গত ডিসেম্বর–জানুয়ারি এই দুই মাসে কমে গেছে ৪০ শতাংশ। ৮০০ থেকে ৫০০ হয়েছে। প্রতিদিন দুবাইয়ে ১৫০০ ওয়ার্ক পারমিট এবং ভিসা বাতিল হচ্ছে, কারণ, কোম্পানিগুলো ছাঁটাই করছে। নাখিল ছাড়াও ছাঁটাই করেছে, দামাক ২০০, আল শফর ১০০০।

প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে আরব আমিরশাহীর জনসংখ্যা ছিল ৬৪ লক্ষ, যাদের মধ্যে ৫৫ লক্ষ বিদেশি। ৩০ লক্ষের বেশি লোক লেবার মন্ত্রকে নথিভুক্ত। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জানা যায় আমিরশাহীর ১.৪৮ ট্রিলিয়ন (১ ট্রিলিয়ন = দশ হাজার কোটি) ডলারের কনস্ট্রাকশন প্রকল্পের ৫৩ শতাংশ থমকে আছে।

দুবাইয়ের ইন্ডিয়ান কনসুলেট থেকে জানা যাচ্ছে, মার্চে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ২০,০০০ সিট বুক করা আছে। ভারতীয় শ্রমিকরা ফিরবে। কোম্পানিগুলো বুক করে রেখেছে। দুবাইয়ের ইন্ডিয়ান কনসাল জেনারেলের হিসেবে দুবাইয়ে দশ লাখ ভারতীয় শ্রমিক কাজ করে। অবশ্য কনসাল জেনারেল বলেছেন, এই কুড়ি হাজার সংখ্যাটা খুব একটা বেশি নয়। এরকম হয়েই থাকে। এ প্রসঙ্গেই এই অভিবাসী শ্রমশক্তি, যা এই পর্যায়ের শিল্পায়নের মূল চালিকাশক্তি বলা যায়, তার দিকে একটু নজর ঘোরানো যাক।

অভিবাসী শ্রমিক ভাগাও!

রাশিয়ায় গত ৫ বছর ধরে নির্মাণ বা কনস্ট্রাকশনে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে। মধ্য এশিয়া, যেমন তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান প্রভৃতি থেকে লোকে চলে আসছে রাশিয়ায়, কনস্ট্রাকশন সাইটে কাজ করার জন্য। ২০০৮ সালে রাশিয়ায় এই নির্মাণ শিল্পে মন্দা লেগেছে। আর রাশিয়ায় নতুন করে জাতীয়তাবাদের উত্থানের কারণে এই বাইরে থেকে যাওয়া শ্রমিকরা প্রায়শই জাতিগত হিংসার শিকার হচ্ছে। রাশিয়ায় অভিবাসী শ্রমিক প্রায় ৯০ লক্ষ। এর ৮০ শতাংশ আসে পূর্বতন সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলি থেকে। আর এর ৪০% যুক্ত কনস্ট্রাকশন শিল্পে, যা সংকটের আগে পর্যন্ত রাশিয়ার প্রধান শিল্প ছিল।

ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব মাইগ্রেশন–এর হিসেবে, ২০০৮ সালের মধ্যে বিশ্বের ২০ কোটি লোক তাদের নিজের দেশ ছেড়ে বাইরে গিয়ে আছে কাজের জন্য। তাজিকিস্তানের জিডিপিতে (দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদ) অভিবাসী শ্রমিকদের অবদান পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি (৩০ শতাংশ, কারোর মতে ৪৬%)। কিরঘিজিস্তানের ২৭% । উজবেকিস্তানের

৮%। ছ' থেকে দশ লাখ তাজিক বাস করে রাশিয়ায়। রাশিয়া ২০০৯–এর জন্য অভিবাসীদের ভিসার পরিমাণ অর্ধেক করে দিয়েছে।

অবশ্য এতে রাশিয়ার জ্বালাও আছে। এ বছর অভিবাসী শ্রমিকরা রাশিয়া থেকে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা দেশে ফিরে যাওয়ার সময় তুলে নিয়ে গিয়েছে। ফেরত যেতে না হলে এর অন্তত এক তৃতীয়াংশ রাশিয়ার ব্যাঙ্কগুলিতেই জমা রাখত তারা। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে রাশিয়ার ব্যাঙ্কগুলো।

ইউরোপে স্পেন হয়ে উঠেছিল নতুন নির্মাণের স্বর্গরাজ্য (জিডিপির ১৬% রিয়েল এস্টেট। মোট শ্রমশক্তির ১২% এই রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রে)। ১৯৯৪ থেকে ২০০৭ — স্পেনে ছিল বৃদ্ধির অর্থনীতি। ২০০০–২০০৫ এই পাঁচ বছরে গোটা ইউরোপে যে কর্মসংস্থান হয়েছিল, তার অর্ধেকই হয়েছিল স্পেনে। এই উন্নয়নে শামিল হয়েছিল উত্তর আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপ এবং লাতিন আমেরিকার অভিবাসী শ্রমিকের দল। মোট সংখ্যাটা প্রায় ৫০ লাখের কাছাকাছি। এক দশক আগে যা ছিল নগণ্য, দশ বছরের কনস্ট্রাকশন বুম–এর মধ্যে দিয়ে তা হয়ে দাঁড়ায় স্পেনের মোট জনসংখ্যার প্রায় দশ শতাংশ। ২০০৪ সালে বামপন্থী নেতা জাপাতেরো এই অভিবাসী শ্রমিকদের সুযোগ–সুবিধা প্রদান ও আইনিকরণের প্রস্তাব নিয়ে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করেন। ২০০৫ সালে প্রায় ছয় লক্ষ বেআইনি অভিবাসীকে আইনিকরণ করেন। কিন্তু সময় বদলে গিয়েছে। রিয়েল এস্টেট বুম এখন আর নেই। স্পেন এখন সরকারিভাবে মন্দায় আক্রান্ত। বেকারত্ব এখন ভয়াবহ, ১২.৮ শতাংশ, ইউরোপের গড়ের তুলনায় ৫.৭ শতাংশ বেশি। এই অভিবাসী শ্রমিকেরা এখন যাতে স্পেন ছেড়ে চলে যায়, তার জন্য সরকার ভর্তুকি দিতে চাইছে (নাম দেওয়া হয়েছে প্ল্যান অফ ভলান্টারি রিটার্ন)। কিন্তু কেউ যাচ্ছে না। বদলে তারা মাদ্রিদে ফুটপাতে বিভিন্ন কিছুর পসরা সাজিয়ে বসে পড়ছে। বেআইনি পেশা তৈরি করে নিচ্ছে, যেমন ফুটপাতে খাবারের দোকান দেওয়া। বলা হয়েছে, অদক্ষ শ্রমিকের জন্য ২০০৯ সালে আর ভিসা দেওয়া হবে না।

রপ্তানি নির্ভর টেক্সটাইল : তিরুপুর

ভারতের টেক্সটাইল শিল্প আগে ছিল মূলত দেশীয় বাজার নির্ভর। ১৯৮০ সালের মধ্যে প্রথম বড়ো রকম রদবদল আসে — বড়ো মিলগুলি বন্ধ হয়। ১৯৯১–তে শুরু হয় টেক্সটাইল পার্ক গড়া। পাঞ্জাবের লুধিয়ানা থেকে তামিলনাড়ুর তিরুপুর, তৈরি হয় ছোটো–বড়ো টেক্সটাইল পার্ক। এখন ভারতের টেক্সটাইল শিল্পের প্রায় অর্ধেকই রপ্তানি হয় এবং এই রপ্তানি বাজারের ষাট শতাংশের ঠিকানা আমেরিকা, জাপান এবং ইউরোপ। কর্মসংস্থানের নিরিখে এই টেক্সটাইল ক্ষেত্র ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষেত্র, কৃষিক্ষেত্রের পরেই। সরাসরি এই সেক্টরে কাজ করে প্রায় সাড়ে তিন কোটি লোক। দেশের মোট রপ্তানির ৩৫ শতাংশই এই টেক্সটাইল থেকে। ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি বিশ্বজুড়ে এই শিল্পের ওপর থেকে রপ্তানির কোটা সিস্টেম (মাল্টি ফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্ট) তুলে দেওয়া হয়। এই কোটা ছিল মূলত শিল্পোন্নত দেশগুলির, অন্যান্য দেশ থেকে সর্বোচ্চ কত বস্ত্র আমদানি করতে পারে, তার ওপর নিষেধাজ্ঞা। ফলে বাধা থাকে না পুরোপুরি রপ্তানি নির্ভর হতে। ভারতে ৭০ হাজার টাকার দেশে তৈরি যন্ত্রের বদলে ১৫–২০ লাখ টাকা দিয়ে অত্যাধুনিক মেশিন আমদানি করার হিড়িক পড়ে। এর ফলে উৎপাদনের হার প্রায় ৫–৬ গুণ বেড়ে যায়।

এই রপ্তানি নির্ভর বস্ত্র–বয়ন শিল্প আজ ডুবতে বসেছে। কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ বা সিটি–র হিসেব অনুযায়ী কাজ যেতে বসেছে ১২ লক্ষ মানুষের, যারা রপ্তানি নির্ভর বস্ত্র–বয়ন শিল্পের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। রেশমের দাম গত বছরে বেড়ে যায় ৩০ শতাংশ। ফলে উৎপাদিত বস্ত্রাদিরও দাম বাড়ে।

টেক্সটাইলের একটি বড়ো জায়গা ছিল তামিলনাড়ুর তিরুপুর। এই তিরুপুরেই ভারতের রপ্তানিযোগ্য বস্ত্রাদির ৬০% তৈরি হয়। ১৯৯৫ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, তিরুপুরে যে সমস্ত বস্ত্র উৎপাদন হয়, তার মধ্যে ৩৫ কোটি ৮০ লক্ষ পিস রপ্তানি হয় আর ২৫ কোটি দেশীয় বাজারে বিক্রি হয়। তিরুপুরে বড়ো বড়ো টেক্সটাইল মিলগুলিতে আজ চলছে স্বেচ্ছাবসর এবং ছাঁটাই। তিরুপুর এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এ শক্তিভেল বলেছেন, প্রায় সমস্ত রপ্তানিকারী ইউনিটগুলিতে লেবাররা আগে এক শিফটে কাজ করত দিনে ১২ ঘন্টা, ৮ ঘন্টার বদলে এবং তা করা হতো ইউনিয়ন ও শ্রমিকদের সম্মতি নিয়েই। এখন অর্ডার কমে গেছে। তাই দিনে ৮ ঘন্টাই কাজ হচ্ছে।

রপ্তানি নির্ভর অলঙ্কার শিল্প : সুরাত

গুজরাতের হীরে পালিশ শিল্প জগদ্বিখ্যাত। গুজরাতে পৃথিবীর ৭২ শতাংশ হীরে পালিশ হয়। এই রাজ্যে ভারতের হীরে রপ্তানির ৮০ শতাংশের শেয়ার রয়েছে। গত কয়েকমাসে এই রাজ্যে ৭০ জন হীরে শিল্পী আত্মহত্যা করেছে। গুজরাতের হীরে শিল্পের প্রায় ৬০ শতাংশ ইউনিট বন্ধ হয়ে গেছে। ৭ লাখ মানুষ সরাসরি এই শিল্পে যুক্ত।

ছ'মাস আগেও গুজরাতের হীরে শিল্পের হাল ছিল চকচকে। তারপর আমেরিকার রপ্তানিতে প্রভাব পড়তে শুরু করে। ৬০ শতাংশ কমে যায় রপ্তানি। প্রসঙ্গত, ৮০ শতাংশ রপ্তানিই হতো আমেরিকায়।

সুরাতেই আছে প্রায় ৬০০০ হীরে পালিশের ইউনিট। এই ইউনিটগুলির অর্ধেক বন্ধ। যেগুলো চালু আছে, তার থেকে অর্ধেক শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গেছে। হীরে শিল্পের মালিকরা এই ব্যবসা ছেড়ে পাড়ি দিয়েছে রিয়েল এস্টেট শিল্পে। জমি কিনে রাখছে তারা। শ্রমিকরা পাড়ি জমিয়েছে অন্য রাজ্যে। জানুয়ারিতে দু'জন হীরে কারিগর ধরা পড়ে মদ চোরাচালানের দায়ে। আরও দু'জন কারিগর একটি দোকান ভাঙতে গিয়ে ধরা পড়ে। মিডিয়ার চাপে পড়ে নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, এই শ্রমিকদের তিনি গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পে কাজের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু এই শিল্পের দক্ষ কারিগরেরা অখুশি। কারণ গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পে রাস্তা নির্মাণ বা রাস্তা চওড়ার কাজে তাদের রোজগারও কম হবে আর দক্ষতাও ব্যবহৃত হবে না। উল্লেখ্য ২০০১–এর ১১ সেপ্টেম্বরের পরে আমেরিকার বাজার খারাপ হয়ে যাওয়ায় সুরাতের এক চতুর্থাংশ ছোটো ও মাঝারি হীরে পালিশের ইউনিট বন্ধ ছিল কয়েক মাস।

রিটেল : ভারত

রিটেল চেন 'সুভিক্ষা' তাদের ভারতজোড়া ১৬০০ স্টোর বন্ধ রাখছে মে মাস পর্যন্ত। কারণ টাকা নেই। যদিও কর্মচারীরা আলাদা কথা বলছে। বলছে অক্টোবর নভেম্বর মাসে বিক্রি কমতে থাকে। দৈনিক একটি স্টোর থেকে যেখানে ২০–৩০ হাজার টাকার বিক্রি হতো সেটা এসে দাঁড়ায় ১০০ টাকায়। বড়ো সাপ্লায়াররা (যেমন হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড) সাপ্লাই বন্ধ করে দেয়। সুভিক্ষার ১৫০০০ কর্মচারী অক্টোবর মাস থেকে কোনও মাইনে পায়নি। ইপিএফ সংস্থার খোঁজখবরের মুখে দাঁড়িয়ে এই সংস্থা তা স্বীকার করেছে। এর মধ্যে সারা ভারতে প্রায় ৬০০টি সুভিক্ষা স্টোরের কর্মচারীরা ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে নিজেদের স্টোরগুলিতেই লুঠতরাজ চালায়। কোম্পানির চেয়ারম্যানের মতে এর মধ্যে ছিল ভেন্ডাররাও, যাদের দীর্ঘদিন ধরে টাকা বাকি। কেন এই লুঠতরাজের কথা থানায় জানানো হয়নি, জিজ্ঞেস করা হলে সুভিক্ষার ম্যানেজিং ডিরেক্টর জানান, থানায় রিপোর্ট করার মতো কেউ ছিল না। শোনা যাচ্ছে, সুভিক্ষা কর্তৃপক্ষ

মাইনের বদলে কর্মচারীদের অবিক্রিত মোবাইল হ্যান্ডসেট দিতে চেয়েছিল। ৮ ডিসেম্বর একটি ওয়েবসাইটে প্রথম একটি খবর পাওয়া যায়, চেন্নাইয়ের ৯৭টি স্টোরের ৭০০ কর্মচারী অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসের মাইনে পায়নি। সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানি এই রিপোর্টের প্রতিবাদ করে এবং এই খবরকে বলে ভুয়ো। সেই রিপোর্টেই জানা যায়, কোম্পানি নভেম্বর মাসের মাইনে দিতে না পেরে বলেছিল স্টোর থেকে জিনিস নিতে। কর্মচারীরা আলওয়ারপেট–এ কোম্পানির হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। কিন্তু হলে হবে কী, মাইনে না পাওয়ার তালিকায় রয়েছে কোম্পানির দু'জন ভাইস প্রেসিডেন্ট। উল্লেখ্য, এই স্টোরটিতে আইসিআইসিআই ভেঞ্চার এবং আজিম প্রেমজির বেশ বড়ো শেয়ার ছিল। প্যান্টালুন রিটেল জানিয়েছে বিক্রি কমে গেছে, গত ৫ বছরের মধ্যে এখন নিম্নতম, জানুয়ারিতে। রিলায়েন্স রিটেল ১০০০ স্টোরের মধ্যে অন্তত ৩৫টি বন্ধ করে দিচ্ছে।

অটোমোবাইল : ডেট্রয়েট

আমেরিকান ভোক্তারা নতুন গাড়ির বদলে পুরনো গাড়ি কিনছেন। বিকিকিনির হিসেব রাখে এরকম একটি সংস্থা এডমুন্ড ডট কম–এর তথ্য অনুযায়ী দু'বছর আগেও এর পরিমাণ ছিল এখনকার ৩৭ শতাংশের মতো। নভেম্বর থেকে জানুয়ারি এই তিনমাসে সমীক্ষা করে তারা দেখেছে, প্রায় ৫ লাখ আমেরিকান ক্রেতা পুরনো গাড়ি কিনেছে, যাদের নতুন গাড়ি কেনার কথা। এই সংস্থার এক ভোক্তা আচরণ–বিশেষজ্ঞের ভাষায়, 'লোকে আর মনেই করছে না, রাস্তায় চলা সবচেয়ে সুন্দর আর সবথেকে নতুন গাড়িটা তাদের চাই।'

অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রির সংকট শুরু হয় ২০০৮–এর মাঝামাঝি সময়টাতে। যখন তেলের দাম মারাত্মক বেড়ে গেছিল বিশ্বজুড়ে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি দেখা যায় ফোর্ড, জেনারেল মোটরস্ এবং ক্রাইসলার, তথাকথিত 'বিগ থ্রি' কোম্পানির বিক্রি কমে গেছে। বরং এই সময়ে বিক্রি কিছুটা বেড়ে গেছিল বেশি মাইলেজ দেয় এইরকম গাড়িগুলির। সেই গাড়িগুলির বেশির ভাগই জাপানি, ইউরোপিয়ান বা গাড়ির বিভিন্ন অংশ বিদেশে তৈরি হয় এবং সেগুলো আমেরিকায় জোড়া দেওয়া হয় (পরিভাষায় ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট), এরকম গাড়ির। ১৯৯৮ থেকে ২০০৮ — এই দশ বছরে আমেরিকায় গাড়ি বাজারে এই বিগ থ্রি–র শেয়ার ৭০ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৫৩ শতাংশ। প্রসঙ্গত, এই কোম্পানিগুলির বেশির ভাগ শ্রমিকই ইউনিয়নভুক্ত, তাই তাদের দাবিদাওয়াও বেশি। ২০০৫–এর এক রিপোর্টে দেখা যায়, জাপানি অটোমেকার টয়োটা সংস্থা আমেরিকার অটোমেকারদের তুলনায় গাড়ি পিছু ৩৫০ ডলার থেকে ৫০০ ডলার কম খরচ করে শ্রমশক্তির পেছনে।

২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে আমেরিকা সরকার প্রথমবারের জন্য এই অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিকে 'বেল আউট' করে, ২৫০০ কোটি ডলার দিয়ে। সরকার থেকে বলা হয় এবার থেকে এই বিগ থ্রি কম জ্বালানি খায় এরকম গাড়ি আবিষ্কারের কথা ভাবুক। আমেরিকায় ২০০৮–এ বিক্রি হয়েছে মোট ১ কোটি গাড়ি। প্রসঙ্গত, মিশিগানের গাড়ি বিশেষজ্ঞ ড্যান লুরিয়ার মতে এই বিক্রিতে কেউই লাভ করতে পারবে না, না বিগ থ্রি, না ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট। ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট–এর লাভ করতে গেলে কম করে বছরে ১ কোটি ২০ লক্ষ বিক্রি লাগে। আর বিগ থ্রির লাগে কম করে বছরে ১ কোটি ৫০ লক্ষ বিক্রি।

চীনে গাড়ি বিক্রি কমে যায় ২০০৮ সালে এবং গাড়ি বিক্রির বৃদ্ধি কমে দাঁড়ায় গত দশ বছরের মধ্যে নিম্নতম। সরকার গাড়ি কেনার ওপর ট্যাক্স ছুট ঘোষণা করে। যেসব গাড়ির এঞ্জিন ১.৬ লিটারের কম, তাদের ক্ষেত্রে এই ট্যাক্স প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। সেই কারণে চীনা কোম্পানিগুলি — যেমন চেরি, গিলি — যারা ছোটো গাড়ি বিক্রি করে, তারা লাভবান হয় জেনারেল মোটর, নিশান, ভোক্সোয়াগান, হুন্ডাই প্রভৃতি কোম্পানির চীনা ইউনিটগুলির তুলনায়। এই বছরের কোনও এক মাসে চেরি তার নিজের বিক্রির ক্ষেত্রে রেকর্ড করেছে।

২০০৯–এর ফেব্রুয়ারিতে ভারতের সবচেয়ে বড়ো ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া গাড়ি লোনের ইন্টারেস্ট রেট কমিয়েছে যাতে লোকে আরও বেশি বেশি গাড়ি কেনে।

জাপানি গাড়ি কোম্পানি টয়োটার অবস্থাও ভালো নয়। ডিসেম্বরে টয়োটা জানায়, গাড়ি উৎপাদনের ব্যবসায় ৭০ বছরে এই প্রথমবার তাদের ক্ষতি হয়েছে। বিক্রি কমেছে ৩৪ শতাংশ। অপর জাপানি কোম্পানি হোন্ডা মোটরের বিক্রি কমেছে ৩১.৬ শতাংশ। এছাড়াও নিশান, সুজুকি, মিৎসুবিশি — এরাও গাড়ি উৎপাদন কমিয়েছে। এইসব ঘোষণাই হয়েছে ২০০৮–এর ডিসেম্বরে। মূলত মার্কিন গাড়ি বাজারে ধসই এর কারণ।

ডেট্রয়েটে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা কমেই চলেছে, সেই ২০০০ সাল থেকে। গাড়ি শিল্পে ওঠা পড়া থাকলেও। সূত্র মার্কিন ব্যুরো অফ লেবার স্টাটিসটিক্স।

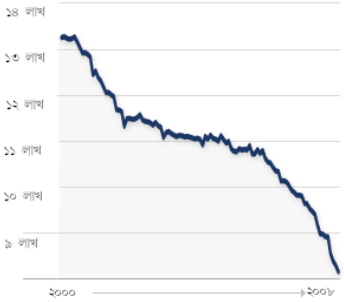

২০০০ সালে আমেরিকায় গাড়ি বিক্রি শীর্ষ ছুঁয়েছিল, বছরে ১ কোটি ৭৪ লাখ। তারপর কমেছে, মাঝে একটু বেড়ে এখন একেবারে তলানিতে। সূত্র মার্কিন কমার্স ডিপার্টমেন্ট।

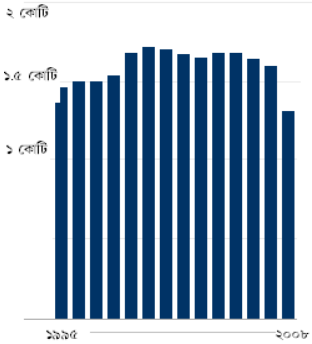

রাশিয়ায় পুতিন ঘোষণা করেন, আমদানি করা গাড়ির ওপর ৩০ শতাংশ আমদানি শুল্ক, যাতে দেশের বাজার এবং চাকরি বাঁচে। এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ হয় রাশিয়ায়। বিশেষ করে ভ্লাদিভস্তক শহরে, যেখান দিয়ে সস্তার জাপানি গাড়িগুলি রাশিয়ায় ঢোকে।

যদিও ভারতে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ২০০৯–এ গাড়ি বিক্রি এবং গাড়ি রপ্তানি দুইই বেড়েছে। মারুতি সুজুকি, হুন্ডাই মোটর, মাহিন্দ্রা মাহিন্দ্রা সবার বেড়েছে। এই বৃদ্ধি ২০০৮ সালের এই সময়ের থেকেও ভালো।

মার্কিন ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের ২০ শতাংশ এই বিগ থ্রি তথা ডেট্রয়েট–এর গাড়ি কারখানাগুলির সাথে যুক্ত। এই সংকটে ডেমোক্রেটিক পার্টির দুই নেতা এই বিগ থ্রি কে একটি চিঠি দিয়ে বলেছেন, তাদের ব্যবসার ধরনে পরিবর্তন আনতে। সংকট ডেট্রয়েট ভিত্তিক মার্কিন গাড়ি শিল্পে কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে চলেছে। এই বিগ থ্রির বিজনেসের সঙ্গে ১৬ লক্ষ কর্মী যুক্ত বিভিন্নভাবে, কেবল আমেরিকায়। আর অটোমোবাইল শিল্পে মোট ৩১ লক্ষ মার্কিনী কাজ করে। ২০ লক্ষ লোক এই শিল্পের ওপর নির্ভর করে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে। ৭ লক্ষ ৭৫ হাজার মানুষ পেনসন প্রভৃতি পায়।

মার্কিন কোম্পানির শ্রমিকরা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। জাপানি কোম্পানির শ্রমিকরা ইউনিয়নভুক্ত নয়। মার্কিন কোম্পানিগুলির যে ইউনিয়ন, আমেরিকায় ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কার্স, তাদের একটি নিজস্ব গলফ কোর্স আছে। এই বিপুলাকায় মার্কিন সংসার যেভাবে চলছিল, তা আর সেভাবে চলবে না। ওবামার ঘোষণা অনুযায়ী, কাঠামোগত পরিবর্তন হতে চলেছে মার্কিন অটোমেকারদের। এবার জোর দেওয়া হবে ছোটো, জ্বালানি

সাশ্রয়কারী গাড়ির দিকে, যাতে করে তা এশিয়ান গাড়ি কোম্পানিগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।

প্রসঙ্গত, এই ইউনিয়নগুলির সাথে আসন্ন মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানিগুলির ২০০৭ সালে এই চুক্তি হয় — মাইনে বাড়বে না, কিন্তু পেনসন বা স্বাস্থ্য পরিষেবায় হাত দেওয়া যাবে না।

স্টিল : চীন

স্টিলের দুবাই মার্কেটে দাম পড়তে শুরু করে ২০০৮–এর জুন মাস থেকে। প্রতি টন স্টিল পাতের দাম সেখানে ১২৫০ ডলার থেকে পড়ে নভেম্বরে

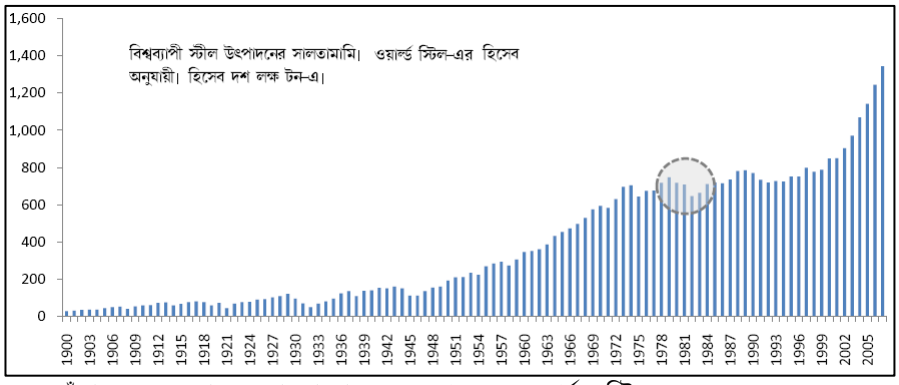

এসে দাঁড়ায় ৩৫০ ডলার। বলা ভালো, ১৯৪৫ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত স্টিলের উৎপাদন বিশ্বব্যাপী বেড়েই চলেছিল। তারপর ২০০০ অবধি এই উৎপাদন মোটামুটি একই ছিল। ২০০০ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সময়কালে স্টিলের উৎপাদনের বৃদ্ধি হয় প্রায় কয়েক গুণ। এই বৃদ্ধির বেশিরভাগটাই কনস্ট্রাকশন বুমের সৌজন্যে।

২০০৮ সালে বিশ্বে যত স্টিল উৎপাদন হয়েছে, তার মধ্যে ৩৭ শতাংশের বেশি চীনে। অলিম্পিককে ঘিরে চীনে ব্যাপক কনস্ট্রাকশনের কারণেই ২০০৪ পরবর্তী সময়ে এই পরিমাণ বৃদ্ধি বলে অনেকে মনে করেন। যাই হোক, এই বৃদ্ধিও থমকাতে শুরু করেছে। ২০০৮–এ বিশ্বে স্টিল উৎপাদনে মন্দা এসেছে, অপ্রতিহত গতিতে বাড়া তো দূরে থাক, কমেছে। এরই মধ্যে শেষ চার মাসে চীনের স্টিল উৎপাদনে ভাঁটার টান। কারণ, চাহিদা নেই। না, দাম কমার ফলেও চাহিদা বাড়ার কোনও লক্ষণ নেই। বস্তুত স্টিলের উৎপাদন ইউরোপ বা আমেরিকায় অনেক দিন ধরেই পড়তির দিকে। এমনকি জাপানের অবস্থাও তথৈবচ। কেবল চীন–ভারত–কোরিয়া–দুবাই–রাশিয়া আর খানিকটা স্পেন ও জার্মানির ওপর ভর করেই স্টিল উৎপাদনের বৃদ্ধি হচ্ছিল। এর মধ্যে চীনের অবদান সিংহভাগ।

চীনের লৌহ ইস্পাত সংস্থার হিসেবে ৭১টি চীনা মাঝারি ও বড়ো স্টিল সংস্থার লাভ কমে গেছে ২০০৮–এ। আর ১৫টি সংস্থার ক্ষতি হয়েছে।

ইস্পাত দানব তৈরি

চীনের চারটে স্টিল–শিল্পাঞ্চলে কয়েক'শ সরকারি মালিকানার, কিন্তু নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ('বাজারি সমাজতন্ত্র') স্টিল উৎপাদক ছিল এমনকি আটের দশকের মাঝামাঝিও। তারপর এইগুলির মধ্যে যেগুলির উৎপাদন ভালো নয়, সেগুলিকে দেউলে ঘোষণা করা, ব্যাক্তিমালিকানায় দিয়ে দেওয়া শুরু হয়। নয়ের দশকের শেষদিকে দক্ষিণ এশিয়ায় অর্থনৈতিক সংকটের মওকায় চীন তার ইস্পাত শিল্পে পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় গতি বাড়ায়। প্রসঙ্গত, ১৯৭০–এর দশকের শেষদিক থেকেই বিশ্বজুড়ে স্টিল উৎপাদনে কর্মীসংকোচন শুরু হয়েছিল। একই প্রক্রিয়া চীনে শুরু হয়েছিল ৮০–র দশক থেকে। যাই হোক, ৯০–এর দশকের শেষ দিকে পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ায় চীন ছোটো ছোটো সংস্থাগুলিকে জুড়ে দিয়ে বড়ো বড়ো সংস্থা তৈরি করতে শুরু করে। ২০০৫ সালে এই প্রক্রিয়ায় আনশান গ্রুপ ও বেংক্সি গ্রুপ মিলে তৈরি হয় আনবেন স্টিল গ্রুপ। একই সাথে ঘোষণা করা হয়, চীনের ৭০০–র বেশি স্টিল সংস্থার বেশিরভাগকে জুড়ে দুটি বড়োসড়ো দানব তৈরি করা হবে, যারা আর্সেলর মিত্তল, নিপ্পন প্রভৃতি দানবের সাথে বিশ্ব বাজারে লড়ে নিতে পারে।

লোকসানের মুখ দেখে আর্সেলর মিত্তল অবধি এই বছরে তাদের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে দিয়েছে ১০ শতাংশের মতো, আর চীনে এই দানবায়ন চলছেই। ২০০৮–এর ১৯ ডিসেম্বর তাংসান এলাকার ২৭টা স্টিল কোম্পানি মিলে গিয়ে তৈরি করেছে তাংসান গ্রেট ওয়াল স্টিল। আর আরও ১২টা মিলে তৈরি করেছে বোহাই স্টিল। এ বছরের জানুয়ারি মাসের সরকারি অর্থনৈতিক প্যাকেজে ৪০০ কিউবিক মিটারের থেকে ছোটো ব্লাস্ট ফারনেস বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে আমেরিকায় সরকারি বদান্যতায় তৈরি হয়েছিল, বেড়েছিল মার্কিন কর্পোরেট। সেই রকমই এক ব্যাপার ঘটছে মন্দার বাজারে, মন্দার দোহাই পেড়ে চীনের স্টিল ক্ষেত্রে। এর সাথেই আছে সরকারি ভর্তুকি, কর ছাড়। কমিয়ে দেওয়া হয়েছে রপ্তানি কর, ৬৭টি ইস্পাত দ্রব্যের ওপরে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেট লবি অবশ্য এইটুকুতে সন্তুষ্ট নয়।

এই দানবায়নের প্রক্রিয়ায় শ্রমিকরা পড়ে মুশকিলে। তাদের ভরসা দেওয়া হয়, চাকরি জুটবে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা আর জোটে না। কেবল কাজ হারিয়ে শ্রমিক বিক্ষোভে ২০০৩ সালে অংশ নিয়েছে প্রায় ৩১ লক্ষ শ্রমিক, যা দশ বছর আগের তুলনায় সাড়ে চার গুণ। শ্রমিকদের দাবির মধ্যে থাকছে বকেয়া বেতন পরিশোধ, পেনশন এবং কোম্পানির স্বাস্থ্য বীমা ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখা, পুনরায় চাকরি পাওয়ার প্রশাসনিক প্রতিশ্রুতি। ২০০৮–এর এপ্রিলে শেনঝেন ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নের ভাইস চেয়ারম্যান ওয়াং টংক্সিন বলেন, 'স্ট্রাইক এখানে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়ার মতোই রোজকার ব্যাপারে পরিণত হয়েছে'। কেবল পার্ল নদীর অববাহিকা অঞ্চলেই প্রতিদিন কমপক্ষে একটা করে অন্তত হাজার খানেক শ্রমিকের ধর্মঘট হবেই।

সাল	মোট (দশ লক্ষ টন)	চীন (দশ লক্ষ টন)
২০০৮	১৩৩০	৫০১ (৩৭.৬%)
২০০৭	১৩৪৪	৪৮৯ (৩৬.৪%)
২০০৬	১২৫০	৪২২.৬৬ (৩৩.৮%)
২০০৫	১১৪৬	৩৫৫.৮ (৩১%)
২০০৪	১০৬৫	২৮০.৫ (২৬.৩%)
২০০৩	৯৬৯.৭	২২২.৪ (২৩%)
২০০২	৯০৪	১৮২ (১৯.৪%)
২০০১	৮৫০	১৫১ (১৭.৮%)
২০০০	৮৪৮	১২৭ (১৫%)
১৯৯৫	৭৫২	৯৫ (১২.৬%)
১৯৯০	৭৭০	৬৬ (৮.৫%)

কর্পোরেট কিস্‌সা : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

সমস্ত ধরনের ব্যবসাই কর্পোরেটদের হাতে পুঞ্জিভূত হয়েছে মার্কিন দেশে। কর্পোরেট, অর্থাৎ যার লগ্নিকারীদের স্বার্থ রক্ষা করাই কোম্পানিটি যারা চালাচ্ছে, তাদের মূল লক্ষ্য। কর্পোরেট কর্মীরা মূলত শ্রমিকদের মধ্যেও কুলীন। তাদের মাইনে, সুযোগ সুবিধার বহর বেশ উঁচু। মন্দার আঁচ লেগেছে এই কর্পোরেট কাঠামোতে। মার্কিন মুলুকে গরিমার প্রতীক ৫০০টি কর্পোরেশনের ২০০৯–এর জানুয়ারি মাসে ছাঁটাইয়ের

সূত্র : ওয়ার্ল্ড স্টিল অ্যাসোসিয়েশন

হিসেব, সূত্র ফোর্বস্ ডট কম।

কোম্পানি (কী ধরনের)	কত ছাঁটাই	
সিয়ার্স হোল্ডিং (রিটেল)	৩০০	
ব্রডকম (ইলেক্ট্রনিক্স)	২০০	
ইন্টারন্যাশনাল গেম টেকনোলজি (খেলনা)	২০০	ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে ছাঁটাই। মোট কর্মীর ৩ শতাংশ।
ক্যাটারপিলার (ম্যানুফ্যাকচারিং)	২১১০	কনস্ট্রাকশন, মাইনিংয়ের যন্ত্রপাতি বানায়।
ইস্টম্যান কোডাক (এন্টারটেইনমেন্ট)	৪৫০০	মোট কর্মীর ১৮ শতাংশ।
টেক্সট্রন (ম্যানুফ্যাকচারিং)	২০০০	এয়ারক্র্যাফট্ বানায়। সাবসিডিয়ারিতে ছাঁটাই।
ফোর্ড (অটোমোবাইল)	১২০০	মোট কর্মীর ২০ শতাংশ।সাবসিডিয়ারিতে ছাঁটাই।
ব্ল্যাক এন্ড ডেকার (শক্তি)	১২০০	বিদ্যুতের যন্ত্রপাতি বানায়।
ওয়াল্ট ডিজনি (এন্টারটেইনমেন্ট)	৬০০	সাবসিডিয়ারি ইএসপিএন ও এবিসি টিভি।
বোয়িং (এয়ারলাইন্স)	১০০০০	মোট কর্মীর ৬ শতাংশ।
স্টারবাক্স (রিটেল)	৬৭০০	কফি ও কফিহাউস রিটেল, আমেরিকায় ৬০০ স্টোর বন্ধ করেছে।
টার্গেট (রিটেল)	১০০০	বিক্রি কমে গেছে।
টাইম ওয়ার্নার্স (এন্টারটেইনমেন্ট)	৭০০	সাবসিডিয়ারি এওএল-এর ১০ শতাংশ, বিজ্ঞাপন কমে গেছে।
ম্যাসকো (ম্যানুফ্যাকচারিং)	৭০	সাবসিডিয়ারি মেরিয়াট-এর ২০ শতাংশ। কনস্ট্রাকশনের সামগ্রী, যেমন জানলা, দরজা বানায়।
টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্ট (ইলেক্ট্রনিক্স)	৩৪০০	মোট কর্মীর ১২ শতাংশ।
আইবিএম (সফট্ওয়্যার)	২৮০০	কয়েকজন বলেছে ভারত, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশে চলে গিয়ে কাজ করতে পারে।
লিঙ্কন ন্যাশনাল (ফাইনান্স)	৫৪০	মোট কর্মীর ৫ শতাংশ ইনসিওরেন্স।
ক্যাটারপিলার (ম্যানুফ্যাকচারিং)	২০০০০	
ফাইজার (ওষুধ)	১৯০০০	মোট কর্মীর ১৫ শতাংশ। ছোটো ড্রাগ কোম্পানি ওয়েথ কিনে নিয়ে নিজের ৫টি কারখানা বন্ধ করে দিল।
স্প্রিন্ট নেক্সটেল (টেলিকমিউনিকেশন)	৮০০০	
হোম ডিপো (ইন্টেরিওর ডিজাইনিং)	৭০০০	
জেনারেল মোটরস (অটোমোবাইল)	২০০০	
ডির এন্ড কোম্পানি (ম্যানুফ্যাকচারিং)	৫০২	সাবসিডিয়ারি ব্রাজিলের। এগ্রিকালচারাল মেশিনারি বানায়।
এবারক্রোমবি এন্ড ফিচ (রিটেল)	৫০	বস্ত্র রিটেল।
হার্লে ডেভিডসন (অটোমোবাইল)	১১০০	মোটরসাইকেল বানায়। মোট কর্মীর ১০ শতাংশ।
মাইক্রোসফট (সফট্ওয়্যার)	৫০০০	৩৪ বছরের ইতিহাসে প্রথম গণ-ছাঁটাই।
হান্টসম্যান (রাসায়নিক)	১৬৬৫	মোট কর্মীর ৯ শতাংশ।
বার্লিংটন সান্টা এফই (রেলওয়ে)	২৫০০	মোট কর্মীর ৫ শতাংশ, ফোর্থ কোয়ার্টারে লাভ হয়েছে, তাও।
ইউএএল (এয়ারলাইন্স)	১০০০	
এসপিএক্স (হরেকরকমবা)	৪০০	
ইন্টেল (ইলেক্ট্রনিক্স)	৫০০০	৫ ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট বন্ধ করেছে।
ওয়াল্ট ডিজনি (এন্টারটেইনমেন্ট)	৫০০	থিম পার্কে লোক আসছে না, তাই বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

উইন রিসর্ট (কনস্ট্রাকশন)	৫৩	
ইটন (ম্যানুফ্যাকচারিং)	৫২০০	মোট কর্মীর ১০ শতাংশ।
টাইম ওয়ার্নার্স (এন্টারটেইনমেন্ট)	৮০০	সাবসিডিয়ারি ওয়ার্নার্স ব্রাদার্স-এর মোট কর্মীর ১০ শতাংশ।
ক্লিয়ার চ্যানেল কমিউনিকেশন (মিডিয়া)	১৮৫০	মোট কর্মীর ৯ শতাংশ।
ডির এন্ড কোম্পানি (ম্যানুফ্যাকচারিং)	১২০	
কনকোফিলিপস (শক্তি)	১৩০০	মোট কর্মীর ৪ শতাংশ।
হার্তজ্ গ্লোবাল হোল্ডিং (কার রিটেল)	৪০০০	
ওয়েলপয়েন্ট (ইনসুরেন্স)	১৫০০	স্বাস্থ্যে ইনসিওরেন্স।
অ্যাডভান্স মাইক্রো ডিভাইস (ইলেক্ট্রনিক্স)	১১০০	মোট কর্মীর ৫ শতাংশ।
জেরক্স (ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট)	২৭৫	
মিডওয়েস্টভ্যাকো (প্যাকেজিং)	২০০০	১৪টা প্ল্যান্ট বন্ধ করেছে।
অটোডেস্ক (সফট্ওয়্যার)	৭৫০	মোট কর্মীর ১০ শতাংশ।
মার্সাল এন্ড ইসলে (ফাইনান্স)	৮৩০	মোট কর্মীর ৮ শতাংশ।
জেনারেল ইলেক্ট্রিক (শক্তি)	১০০০	জেট-ইঞ্জিন ডিভিশন থেকে।
ইকোল্যাব (স্যানিটেশন সাপ্লাই)	১০০০	মোট কর্মীর ৪ শতাংশ।
ডেলটা এয়ারলাইন্স (এয়ারলাইন্স)	২০০০	মোট কর্মীর ৮ শতাংশ, ক্যাপাসিটি কমাল।
মোটোরোলা (ইলেক্ট্রনিক্স)	৪০০০	
গুগল (সফটওয়্যার)	১০০	ঠিকা ও অস্থায়ী ছাঁটাই।
কামিনস্ (ম্যানুফ্যাকচারিং)	৮০০	এছাড়াও এবছরে আর মাইনে বাড়বে না।
ফাইজার (ওষুধ)	৮০০	গবেষক ছাঁটাই, কারণ পেটেন্ট কমে যাচ্ছে।
মোজায়েক (সার)	১০০০	
টেক্সট্রন (এয়ারক্র্যাফট্)	২০০০	সাবসিডিয়ারি সেসেনা।
বেস্ট বাই (রিটেল)	৫০০	হেডকোয়ার্টারে ছাঁটাই।
প্রিসিসন কাস্ট পার্টস (ম্যানুফ্যাকচারিং)	৪০	এয়ারক্র্যাফট্-এর মেটাল শিট প্রভৃতি।
ওরাকল (সফটওয়্যার)	৫০০	
বোয়িং (এয়ারলাইন্স)	৪৫০০	
ফ্রিপোর্ট ম্যাকমোরান (মেটাল)	১৫৫০	তামা ডিভিশন থেকে।
স্মিটফিল্ড ফুড (রিটেল)	৭৫	
ইউনিয়ন প্যাসিফিক (রেলরোড)	২৩০	
জেনারেল ডায়নামিক (ম্যানুফ্যাকচারিং)	১৭৯	সাবসিডিয়ারি থেকে ছাঁটাই।
ইটন (ম্যানুফ্যাকচারিং)	৭৮	
ওয়ালগ্রিন (ওষুধ)	১০০০	মোট কর্মীর ৯ শতাংশ।
ইএমসি (সফটওয়্যার)	২৪০০	
আলকোয়া (মেটাল)	১৩৫০০	অ্যালুমিনিয়াম ডিভিশন থেকে, এছাড়া বেতন আর বাড়বে না।
ম্যাসকো (ম্যানুফ্যাকচারিং)	৩০	সাবসিডিয়ারি অ্যাকোয়া গ্লাস থেকে ছাঁটাই।

সিগনা (ইনসিওরেন্স)	১১০০	মোট কর্মীর ৪ শতাংশ, স্বাস্থ্য ইনসিওরেন্স।
ইউনাইটেড স্টেটস্ স্টিল (মেটাল)	৫০	স্টিল।

আমেরিকার প্রথম ৫০০ কর্পোরেশনে ছাঁটাইয়ের মাসকাবারি হিসেব

নভেম্বর ২০০৮	ডিসেম্বর ২০০৮	জানুয়ারি ২০০৮	ফেব্রুয়ারি ২০০৮
৯১২৫০	১,০৮,১২৩	১,৬৩,৬৬২	১,১৭,৬৩৯ (১৯ ফেব্রুয়ারি)

তথ্যপ্রযুক্তি : ভারত

ভারতের কর্পোরেট তথ্য প্রযুক্তি শিল্পেও ধাক্কা লেগেছে। দৈত্যরা, যেমন টিসিএস, উইপ্রো, কগনিজেন্ট প্রভৃতির মার্কিন দেশের প্রজেক্টগুলি হাতছাড়া হয়ে চলেছে। উদ্বিগ্ন কর্তাব্যক্তিরা আমেরিকা পশ্চিম ইউরোপে গিয়ে বসে আছেন, প্রজেক্ট ধরার জন্য। আর এদেশে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যেসব ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আগাম চাকরির চুক্তি করা হয়েছিল, সেইসব চাকরিতে যোগ দেওয়ার তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। উইপ্রো বলেছে, সফটওয়্যার কর্মী হিসেবে নেওয়া ছাত্রছাত্রীদের বিপিও-তে যোগ দিতে। ২০০৮-এ শিক্ষা ঋণ নিয়ে পড়ে নেতাজী সুভাষ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করা এক ছাত্র চোখেমুখে অনিশ্চয়তার ছাপ নিয়ে জানিয়েছে, 'উইপ্রো বলেছে কাজে যোগ দিতে হবে না। কি করব বুঝতে পারছি না। লোনের টাকা শোধ দিতে পারছি না। ব্যাঙ্ক চাপ দিতে শুরু করেছে। এখন টিউশন শুরু করেছি'। কর্মীদের বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দিচ্ছে টিসিএস, কিন্তু তা আর ক'দিন? নামী কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করা ছাত্রছাত্রীরা একটু দেরিতে কাজে যোগ দেওয়ার ডাক পেলেও অনামী কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ঘোর সংকট। ছোটোখাটো তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি ট্রেনিদের বরখাস্ত করেছে। সংকটে বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রছাত্রীদের গণ হারে ফেল করানো হচ্ছে। কারণ তারা নাকি যথেষ্ট তৈরি নয় এখনও। ছাত্রছাত্রীরা ভাঙচুর চালাচ্ছে কলেজে কলেজে।

কলকাতার প্রায় হাজার খানেক কর্মী নিয়ে চলা ইউজিন সংস্থা উবে গেছে হঠাৎ। তারা চাকরি দেবার পূর্বশর্ত হিসেবে প্রত্যেক চাকরি প্রার্থীর কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে নিয়েছিল।

ভারতের আরেক তথ্যপ্রযুক্তি দানব সত্যম তার সমস্ত পুঁজি তথ্যপ্রযুক্তি থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে মত্যস রিয়েল এস্টেট কোম্পানির নামে জমি কিনে রেখে দিয়েছে প্রায় গোটা অন্ধ্রপ্রদেশ জুড়ে। এই মন্দার বাজারে জমিই একমাত্র যাকে বলে অ্যাসেট।

ছোটো নজরে বিশ্বমন্দা

জিতেন নন্দী

মন্দা কথাটা টিভি আর খবরের কাগজের মারফত অনেক জায়গায় ছড়িয়েছে। ব্যাপারটা কী? মন্দা কথাটা সামান্য ভেঙে অনেক সময় বলা হয় অর্থনৈতিক সংকট — মানে অর্থনীতির একেবারে ল্যাজে-গোবরে অবস্থা। কিন্তু অর্থনীতি ব্যাপারটাই বা কী? প্রত্যেকে নিজের হালচালের নিরিখে ব্যাপারগুলো বুঝতে চায়। আমাদের চারপাশের খেটে খাওয়া মানুষের জগতে ব্যাপারগুলো কীরকম? এটাই আমার অনুসন্ধানের বিষয়। কিছুদিন আগে বিখ্যাত এক পণ্ডিত অর্থনীতিবিদ অমিত ভাদুড়ির বই ('আত্মমর্যাদার সঙ্গে উন্নয়ন : পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষে') নিয়ে দুদিনের এক আলোচনায় গিয়েছিলাম। লেখক নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ওই বইয়ে 'পূর্ণ কর্মসংস্থান' কথাটা খুব গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু 'পুর্ণ কর্মসংস্থান' ব্যাপারটা কী? কেউ বলবে, সেটাও জানো না, পূর্ণ কর্মসংস্থান মানে হল সকলের কাজ। দেওয়ালে কখনও লেখা দেখোনি, সকলের কাজ চাই। দেখেছি বটে। তবে সেখানেও একটা প্রশ্ন তুলব, কাজ বলতে কী? খেটে খাওয়া মানুষের দিক থেকে ব্যাপারটা কীরকম? প্রশ্নটা কি আলটপকা? মোটেই নয়। এই তো খবরের কাগজে লিখছে, এত লোকের কাজ চলে যাচ্ছে, আন্দাজ করা হচ্ছে এত এত লোকের কাজ চলে যাবে এবছরের মধ্যে। কেন? মন্দা হলে তো ছাঁটাই হয়, তাও জানো না? তাহলে দেখা যাচ্ছে মন্দা বা অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে কাজ ব্যাপারটা যুক্ত।

যে কাজ করে সে-ই কি শ্রমিক? কাজ মানেই কি শ্রম?

ভোর থেকে রাত পর্যন্ত সংসারের হ্যাপা সামলায় যে ঘরের বৌ, সে শ্রমিক নয়। কারখানার গেটের সামনেই ঝুপড়িতে দিনরাত শ্রমিকদের সস্তায় ভাত-রুটি বা নাস্তা বানিয়ে দেয় যে মানুষটি, সে শ্রমিক নয়। এমন অনেকের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যারা কাজ করে, কিন্তু তাদের শ্রমিক বলা হয় না। কেউ বলবে, নিজের কাজ নয়, যে পরের কাজ করে সে হল শ্রমিক। তাহলে মেটেবুরুজের ওস্তাগরের কাছে যে সেলাইয়ের কাজ করে, তাকে শ্রমিক বলা হয় না কেন? কেন তার নাম দর্জি বা কারিগর? পাঠকপাড়ায় ডাক্তারদিদির বাড়িতে কাজ করেন তিনজন মহিলা, একজন পুরুষ। মহিলাদের মধ্যে একজন আয়া, একজন ঠিকে ঝি আর একজন রান্নার লোক। পুরুষ হল ড্রাইভার। এঁরা সপ্তাহে সাতদিনই কাজ করেন, সেরকম দরকার পড়লে ছুটি নেন। পরের জন্য গতর বেচেই এঁদের দিন ফুরিয়ে যায়, তবু তাঁরা শ্রমিক নন। আপনি হয়তো রেগে যাচ্ছেন, মনে মনে বলছেন, এ আবার কী, নাম নিয়ে এঁড়ে তক্ক।

কিন্তু এই তর্কটা এদেশের সরকারি পরিকল্পনাকারী বা অর্থনীতিবিদদের মধ্যে চলছে অনেকদিন ধরে।[১] আজও তা মিটেছে বলা যায় না। কারণ নানান ধরনের, নানান চরিত্রের কাজ রয়েছে। যত দিন যাচ্ছে তা সরল না হয়ে আরও জটিল হয়ে উঠছে। পরের কাছে পয়সার বিনিময়ে কাজ করলেই তাকে শ্রমিক বলা যাচ্ছে না। প্রশ্ন উঠছে, সে কতদিন কতক্ষণ পরের কাছে কাজ করে? দিন বলতে হপ্তা, মাস না বছর কোনটা ধরা হবে? যেমন, কলকারখানায় টানা ২৪০ দিন কাজ করলে তাকে নিয়মিত বা রেগুলার শ্রমিকের মর্যাদা দেওয়ার কথা আইনে আছে। তবে সেখানেও বিস্তর ঝামেলা বেধে যায়। 'টানা' কাজ বলতে কী? কী ধরনের কাজ — কারখানার মূল উৎপাদনের কাজ না অন্য ফালতু কাজ? নিয়মিত কাজে কি কোম্পানি অনিয়মিত বা ক্যাজুয়াল শ্রমিক নিয়োগ করতে পারে? যেমন, হিন্দমোটর কারখানাতেই মালিদের বাগানের কাজ নিয়ে একটা বিরোধ লেগেছিল একসময় ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে শ্রমিক-ইউনিয়নের।

[১] ১৯৭০ সালে অধ্যাপক এম এল দান্তওয়ালার সভাপতিত্বে বিশেষজ্ঞদের কমিটি প্ল্যানিং কমিশনের কাছে রিপোর্ট পেশ করে বলেছিল, 'আমাদের জটিল অর্থনীতিতে শ্রমশক্তি, কর্মনিয়োগ ও বেকারত্বের চরিত্র একটা একমাত্রিক পরিমাপের হিসেবে দেখানোর পক্ষে বড়ো বেশি বহুধর্মী।'

মালিরা গাড়ি বানাত না বটে, কিন্তু বাগানের পরিচর্যাও ছিল নিয়মিত কাজ। এরকম আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। বিশেষত ইদানীং এই ধরনের টানাপোড়েন আগের থেকে বেড়েছে আর জটিলও হয়ে উঠেছে। এবারে যখন মাস বা হপ্তার হিসেব আসে, তখনও মাসে বা হপ্তায় ক'দিন কাজ করলে তাকে শ্রমিক বা এমপ্লয়েড বলা যাবে, তা নিয়েও গভীর তর্ক আজও রয়েছে। তা মেটাতে না পেরে গবেষকেরা বেকারের মধ্যেও ভয়ানক বেকার (সিভিয়ারলি আনএমপ্লয়েড), পার্ট-টাইম ওয়ার্কার, হোম ওয়ার্কার, আন্ডারএমপ্লয়েড ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করতে চান। তবু এদেশের খেটে খাওয়া মানুষ আর তার কাজের চরিত্রকে এসব নামের বাঁধনে মেপে নেওয়া যায় না। তখন সরকারি পণ্ডিতেরা অন্য একটা বাঁধনে কাজের এই গোলমেলে জগৎটাকে বেঁধে ফেলতে চান। সেটা হল 'অসংগঠিত' শ্রমিক।

অসংগঠিত শিল্প, অসংগঠিত শ্রমিক

এদেশের শিল্পে একটা বড়াই করার মতো ক্ষেত্র ছিল অতীতে, সংগঠিত ক্ষেত্র বা অর্গানাইজড সেক্টর। এমনকী বামপন্থীদেরও মজবুত সংগঠন বলতে বোঝাত সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের ইউনিয়ন, পার্টি ইউনিট, সেল ইত্যাদি। নেহরুর স্বপ্নের শিল্পোন্নত ভারত, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র, স্বনির্ভর ভারি শিল্প ইত্যাদির কয়েক দশক পার হয়ে গেল। তারপর এল নয়া উদারনীতির নব শিল্পায়নের শ্লোগান। তাও দু'দশকে একটু পুরনো হয়ে গেল। ভারতের বৃদ্ধি বা গ্রোথ নিয়ে সাফল্যের ফলে বিশ্বে প্রথম সারিতে ভারত উঠতে চলল। কিন্তু দেখা গেল সেই 'উজ্জ্বল', 'উন্নত' ভারতের সংগঠিত ক্ষেত্রে মাত্র ৭.৬ % শ্রমজীবী বা কাজের লোকের ঠাঁই হয়েছে। তার বাইরে রয়ে গেছে গ্রাম ও শহরের ৪৫.৭ কোটি বা ৯২.৪% খেটে খাওয়া মানুষ। ১৯৯২ সালের আগের দশ বছরে জাতীয় আয় বেড়েছিল ৯৭%, তুলনায় পরের বারো বছরে জাতীয় আয় বেড়েছে ১২৫%। দারুণ উন্নতি! কিন্তু ওদের হিসেব মতোই ৯২.৪% খেটে খাওয়াদের ভারতবর্ষে অবস্থাটা লজ্জাজনক। দেশের ৮৩.৬ কোটি বা ৭৭% মানুষ দৈনিক মাথাপিছু ২০ টাকা খরচ করতে অক্ষম। অথচ দুনিয়ার বাজারে উন্নত ভারতের ঢ্যাঁড়া পেটা হয়ে গেছে। তাহলে 'অনুন্নত' ভারতকে একটু বৃদ্ধির স্বাদ চরণামৃত (ইনক্লুসিভ গ্রোথ) দেওয়া যাক। সরকার যেন নড়েচড়ে বসল। অসংগঠিত ক্ষেত্রের কাজের অবস্থা আর জীবনযাপনকে একটু ভদ্রস্থ করার জন্য কমিশন বসানো হল। কমিশন দেখল, এতদিন অসংগঠিত ক্ষেত্রের কাজ আর তার শিল্প ব্যাপারটা ছিল যথেষ্ট গোলমেলে, অস্পষ্ট। এক-এক জায়গায় এক-এক রকম। প্রথমে তাকে স্পষ্ট করার চেষ্টা হল।

দেখা গেল, অসংগঠিত শ্রমিক শুধু অসংগঠিত ক্ষেত্রেই নেই, তা সংগঠিত ক্ষেত্রেরও অনেকখানি জুড়ে রয়েছে। সংগঠিত ক্ষেত্রের অর্থাৎ কারখানা/দপ্তরের ঠিকা, বদলি, ভাগা, পার্ট-টাইম সবই অসংগঠিত শ্রমিক। নয়া উদারনীতি বা নব্য শিল্পায়নের প্রথম পর্ব (১৯৯৯-২০০০)-এর তুলনায় পরের পর্ব (২০০৪-০৫)-এ অনেক বেশি নতুন চাকরির সৃষ্টি হয়েছে বলে যে দাবি করা হয়; গুজরাত মহারাষ্ট্র না পশ্চিমবঙ্গ কে কাকে শিল্পায়নের দৌড়ে টেক্কা মেরেছে, এ নিয়ে যে বিস্তর হৈ-চৈ করা হয়, তা হল আদতে অসংগঠিত শ্রমিকের খারাপ কাজের পরিবেশে কম মাইনের চাকরি। সংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা সবদিক থেকেই কমেছে। নিচের সারণি থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

ক্ষেত্র/শ্রমিক	মোট নিয়োগ কোটিতে (%)		
	ইনফর্মাল/অসংগঠিত শ্রমিক	ফর্মাল/সংগঠিত শ্রমিক	মোট
		১৯৯৯-২০০০	
ইনফর্মাল/অসংগঠিত ক্ষেত্রে	৩৪.১৩ (৯৯.৬)	০.১৪ (০.৪)	৩৪.২৬ (১০০.০)
ফর্মাল/সংগঠিত ক্ষেত্রে	২.০৫ (৩৭.৮)	৩.৩৭ (৬২.২)	৫.৪১ (১০০.০)
মোট	৩৬.১৭ (৯১.২)	৩.৫ (৮.৮)	৩৯.৬৮ (১০০.০)
		২০০৪-২০০৫	
ইনফর্মাল/অসংগঠিত ক্ষেত্রে	৩৯.৩৫ (৯৯.৬)	০.১৪ (০.৪)	৩৯.৪৯ (১০০.০)
ফর্মাল/সংগঠিত ক্ষেত্রে	২.৯১ (৪৬.৬)	৩.৩৪ (৫৩.৪)	৬.২৬ (১০০.০)
মোট	৪২.২৬ (৯২.৪)	৩.৪৯ (৭.৬)	৪৫.৭৫ (১০০.০)

নোট : বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যাগুলি হল শতকরা হিসেব।

সূত্র : এনএসএস ৬১তম রাউন্ড ২০০৪-২০০৫ এবং এনএসএস ৫৫তম রাউন্ড ১৯৯৯-২০০০, এমপ্লয়মেন্ট-আনএমপ্লয়মেন্ট সার্ভে।

এই হিসেবগুলো পাওয়া যাচ্ছে কৃষি ও অ-কৃষি ক্ষেত্র মিলিয়ে। অতএব এই পরিসংখ্যানের মধ্যেই রয়েছে পরোক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ স্বীকারোক্তি, ভারতবর্ষের যাবতীয় সম্পদ — খাদ্য থেকে শুরু করে ইস্পাত — তৈরি করে (সরকারি ভাষায়) সেইসব দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমিক, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে ইনফর্মাল, অসংগঠিত। ফর্মালরা কাজ ও সংখ্যার দিক থেকে অতি নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও তারাই মূলস্রোত। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ যারা করে চলেছে তারা প্রান্তিক।

যেমন, ডাক বিভাগের কথাটাই ধরা যেতে পারে। ব্রিটিশ আমল থেকে সেখানে বিভাগীয় কর্মচারীর মর্যাদা না দিয়ে একদল ইডি কর্মচারীকে খাটানো হয়ে এসেছে। আজ তারাই দেশের ৯০% ডাকঘর চালায়, পুরো সরকারি ডাক ব্যবস্থার ৭০ ভাগ কাজ তারাই করে। আজ এদের ছাড়া পোস্টঅফিস অচল। অতএব নটরাজ মূর্তি কমিটি নামে এক কমিশন বসিয়ে এদের পার্ট-টাইম কর্মচারী হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। অর্থাৎ আগামীদিনে সস্তায় যাদের কাছ থেকে কাজ গুছিয়ে নিতে হবে, তাদের চটপট ভদ্রলোকেদের ভাষায় দেগে দেওয়া দরকার।

হিন্দুস্তান লিভারের গার্ডেনরীচ ফ্যাকট্রিতে বয়লার শপে একজন শ্রমিক মাথায় গামছা বেঁধে ফ্লোরে যাচ্ছিলেন। এক অফিসার তাঁকে দেখে বললেন, 'কী রে তোর মতো মাথায় গামছা বেঁধে তো কাউকে এখানে কাজ করতে দেখিনি।' সেই শ্রমিক জবাব দিলেন, 'আপনার মতো রিটায়ারের পর এসে অফিসারি করতেও তো কাউকে দেখিনি।' অফিসার ভদ্রলোক একদম চেপে গেলেন।

অফিসারকে দিয়ে পরীক্ষাটা শুরু হয়েছে। কোম্পানির বয়লার শপের ওই অফিসারটি ৭৫০০০ টাকা মাস-মাইনেতে অবসর নিয়েছিলেন। এখন ২৫০০০ টাকা মাইনেতে কন্ট্রাক্টে ঢুকেছেন। আসলে মন্দার বাজারে এজাতীয় ভদ্রলোকেদের একটা স্তরকেও চেঁছে ছোটোলোকেদের স্তরে নামিয়ে আনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। মন্দার বাজারে যেন বা দয়া করেই বলা হচ্ছে : ছাঁটাই কোরো না, বরং মাইনেটা কমিয়ে দাও।

নতুন অত্যাধুনিক বড়ো কারখানা, মিডিয়া বা আইটি সেক্টরে যাদের প্রফেশনাল বা নলেজ ওয়ার্কার বলা হয়, তাদের কাজ কিন্তু ঠিকা বা

কন্ট্রাক্ট। কন্ট্রাক্ট রিনিউয়াল না হলেই তারা বেকার। অথচ আগে ঠিকেপ্রথা বলতে বোঝাতো অসংগঠিত ক্ষেত্রের কাজ।

ভদ্রলোক বনাম ছোটোলোকের জগৎ

আজ থেকে একশ বছর আগেও আমাদের সমাজে একটা ভাগাভাগি ছিল : ভদ্রলোক আর ছোটোলোক। ভদ্রলোক মানে উত্তম আর ছোটোলোক মানে নীচ-ইতর। আসলে ভদ্রলোকরাই ক্ষমতার জোরে নিজেদের এইভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছিল। এখন হয়তো তত্ত্বে বা সাহিত্যে এই নামে ভাগাভাগি আর দেখা যায় না। কিন্তু সমাজে? বেশ মনে পড়ে, আমাদের ছেলেবেলায় আমরাও ভাইবোন বা পড়শিরা ঝগড়াঝাটির সময় একে অপরকে 'ছোটোলোক' বলে গাল দিতাম। এই ছোটোলোক কারা? সমাজে এদের আলাদা আলাদা নাম রয়েছে। যেমন, বাগাল, মুনিষ, ধাঙড় বা মেয়েদের ক্ষেত্রে কামিন। ভদ্রলোকেদের চোখে বিচিত্র ও বিশাল এক কাজের জগতের মানুষেরা হল ইতর, নীচ। ব্রিটিশ এদেশে রাজত্ব করতে এসে এই বিশাল কাজের জগতের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করেছে ভদ্রলোকেদের মাধ্যমে। ভদ্রলোকেরা বিদেশি শিক্ষা-দীক্ষা, চাল-চলন রপ্ত করেছে। তারাই সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছে ভদ্র জীবনযাপনের লক্ষ্য — বড়ো নজর।

ছোটো নজর, বড়ো নজর

একটা জলজ্যান্ত উদাহরণ দিয়ে এই দু'রকম নজরের বিষয়টা পরিষ্কার করা যায়। অতীতে অবিভক্ত বাংলায় মুসলমানদেরও ছোটোলোকেদের মধ্যে ধরা হত। আমাদের মেটেবুরুজে গত কয়েক'শ বছর ধরে এক বাঙালি মুসলমান সমাজের বাস। এরা অতীতে ছিল এক চাষিসমাজের নিচের অংশ। পরে মেটেবুরুজে যখন আধুনিক কল-কারখানা তৈরি হল, এই মুসলমান বাঙালিরা সেখানে তেমন ঢুকল না। এরা ক্রমে একটা আলাদা দর্জিসমাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯৫০-এর দশকে গ্রাম-মেটেবুরুজে এরা ছিল অভাবী, গরিব। এই 'গরিব' শব্দটা অবশ্য আরবি থেকে মুসলমান সমাজে এসেছে। আমরাও স্বচ্ছন্দে তা ব্যবহার করি। ১৯৮০-র দশকের পর থেকে মেটেবুরুজে সস্তার জামাকাপড় তৈরি ও তার ব্যবসা বেশ তেজি হয়ে উঠল। এখানে গড়ে উঠল এক উঠতি বড়োলোক ওস্তাগর সম্প্রদায়। ওস্তাগরদের মধ্যে একটা ছোটো অংশ হয়ে উঠল ধনী, বাকিরাও আর নিছক দর্জি রইল না, তারা হয়ে উঠল পেটি (ছোটো) ওস্তাগর — কেতাবি ভাষায় যাদের বলা হয় স্বনিয়োজিত বা সেলফ এমপ্লয়েড। এবার এই ধনী ওস্তাগররা হাতে পয়সা পেয়ে হিন্দু ভদ্রলোকেদের যাবতীয় গুণ (নাকি বদগুণ!) নকল করতে শুরু করল। যারা নিজেরা দলিজে সেলাই কলের পাঠে শৈশব কাটিয়ে বড়ো হয়েছে, তারাই নিজের বাচ্চাদের পাঠালো ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে; কিনে ফেলল মোটরবাইক-গাড়ি আর বানিয়ে নিল প্রাসাদের মতো পেল্লায় সব বাড়ি। মাত্র কয়েক দশক আগেও এক গ্রাম্য সরল জীবনযাপন আর সামাজিক দায়বোধ দেখা যেত এই দর্জিসমাজে। কিন্তু বড়ো ওস্তাগরদের মধ্যে আরও আরও পয়সার জন্য যাবতীয় পাপকাজে আর তেমন দ্বিধা রইল না। একটা ছোটো উদাহরণ দিই। জিন্‌সের অ্যাসিড ওয়াশের মতো ভয়ঙ্কর পরিবেশ দূষণকারী ব্যবসায় তারা হাত পাকিয়ে ফেলল। অতএব প্রশাসন, পার্টি, মাসল্‌ম্যান ইত্যাদি ওপরমহলকে হাত করার কাজেও তারা দক্ষ হয়ে উঠল। দর্জিসমাজের সরল, সাদাসিধে গ্রামীণ জীবন ফুঁড়ে মাথা তুলল এক উদ্ধত, বিকৃত রুচিসম্পন্ন ভদ্রসমাজ।

এক কথায় বললে, মেটেবুরুজের এই উচ্চবিত্ত ওস্তাগরেরা দুনিয়াটাকে ভদ্রলোকেদের চোখ দিয়ে দেখতে শুরু করেছে। আমাদের ছেলেবেলায় বাবা-মা এটাকেই তারিফ করে বলতেন, বড়ো নজর, উঁচু নজর। এর জন্য আমাদের শেখানো হত, ছোটোলোকেদের সঙ্গে মিশবি না। দেখেছি, এই উঁচু নজর থেকেই কারখানার শ্রমিক তাঁর ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানানোর জন্য সর্বস্ব পণ করেছেন; মেয়েকে তেমন লেখাপড়া না শিখিয়ে ছেলেকে সেন্ট থমাস স্কুলে মোটা টাকা দিয়ে ভর্তি করেছেন; নিজের সারা জীবনের জমানো টাকায় ছেলেকে কম্পিউটার কোর্স পড়িয়েছেন; ইত্যাদি। কেন? না, জাতে উঠতে হবে, বাবু হতে হবে।

বাম বা র‍্যাডিকাল পলিটিক্সেও ঘুরপথে এই বড়ো নজর মর্যাদা পেয়েছে। কারণ টিভি, ফ্রিজ, গাড়ি, বাড়ি আর আধুনিক জীবনযাপনের প্রতি সংগঠিত শ্রমিকদের কামনাকে সেখানে প্রশ্ন করা হয়নি। বরং ট্রেড-ইউনিয়নে দাবি করা হয়েছে এমনভাবেই যাতে বাবুদের লেভেলে শ্রমিকেরা উঠতে পারে। যাদের মনটা এইভাবে মধ্যবিত্ত বাবুয়ানায় মজে গেল, তারা কোনদিনই একই কারখানা/দপ্তরের (সংগঠিত শিল্পের) ঠিকা শ্রমিক/কর্মচারীকে সমগোত্রীয় বলে মনে করেনি। ঠিকা শ্রমিকেরা বহু সময় স্থায়ী শ্রমিকদের আন্দোলনে মদত দিয়েছে, কিন্তু এখানেও ভদ্রলোক আর ছোটোলোকের ভাগাভাগি ঘোচেনি। মে দিবসের সকালে দেখেছি, কারখানার গেটে সংগঠিত শ্রমিক-ইউনিয়ন মে দিবস উদ্‌যাপন করছে, গাছে উঠে ঝাণ্ডা বাঁধছে ঠিকা শ্রমিকরা, তারাই স্থায়ী শ্রমিকভাই(!)দের ফাইফরমাস খাটছে।

স্বনিয়োজিত, সেলফ এমপ্লয়েড বা গতর খাটার স্বাধীন কর্মজগত

অসংগঠিত শ্রমিকদের নিয়ে সরকারি কমিশনের রিপোর্টে এদেশের কর্মজগতের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথ্যের আকারে উঠে এসেছে। এদেশে প্রতিদিন যত কাজ হয়, তার অনেকটাই সারে গতর খাটা মালিকেরা। অর্থনীতির ভাষায় এদের বলা হয়েছে সেলফ এমপ্লয়েড বা স্বনিয়োজিত। ২০০৪-০৫ সালের সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, এদেশের শ্রমশক্তির ৫৬.৫% স্বনিয়োজিত, ২৮.৩% ক্যাজুয়াল বা অনিয়মিত শ্রমিক আর মাত্র ১৫.২% নিয়মিত শ্রমিক। এটা কৃষি আর অ-কৃষি ক্ষেত্র মিলিয়ে হিসেব। কৃষিতে প্রান্তিক বা ছোটো চাষিরা তো সকলেই স্বনিয়োজিত; এমনকী বড়ো চাষিদের মধ্যে যাদের আয়ের মূল অংশ নিজের ও পরিবারের গতর খাটা শ্রম থেকে আসে, মজুরি-শ্রমিক খাটিয়ে আসে না, তারাও স্বনিয়োজিত। অকৃষি ক্ষেত্রে যদি আমরা অসংগঠিত ক্ষেত্রের চেহারাটা দেখি, সেখানে স্বনিয়োজিতের অংশ অনেক অনেক বেশি। কমিশন এটাও বলেছে, এই স্বনিয়োজিত ধারণাটার মধ্যে তার আসল চেহারার অনেকটাই ধরা পড়েনি। তাহলে দেখা যাক, আসল চেহারাটা কী?

মেটেবুরুজের দর্জিসমাজের কথা আগেই বলেছি। পশ্চিমবঙ্গের আনুমানিক ছ' লক্ষ দর্জিশ্রমিকের মধ্যে অর্ধেকের বেশি রয়েছে মেটেবুরুজ আর পার্শবর্তী মহেশতলায়। এখানকার বংশানুক্রমিক ওস্তাগরদের দলিজে এই কারিগররা কাজ করে। ওস্তাগরদের ৭০% কিন্তু 'স্বনিয়োজিত', এখানে এদের নাম পেটি ওস্তাগর। মূলত বাসস্থানই এদের কাজের জায়গা, পরিবার হল এই পেটি উদ্যোগের এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মশক্তি। যৌথ পরিবারও রয়েছে বহু। বছরের বিভিন্ন সময়ে দু-পাঁচ-দশজন লোক তারা কাজেও লাগায়। আবার হাতে অর্ডার না থাকলে নিজে অন্যের দলিজে খাটতেও যায়। অর্থাৎ যেটা বলতে চাইছি, আমাদের দেশের এক বিশাল ক্ষেত্র জুড়ে আছে সেইসব খেটে খাওয়া মানুষ, যাদের শ্রমিক বা মালিক পরিচয় মোটেই স্পষ্ট নয়। সরকারি পরিসংখ্যানে যাকে ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার বলা হচ্ছে, সে হয়তো একই সঙ্গে একজন খেতমজুর। যাকে কারখানায় দেখা যাচ্ছে ফিটার-মিস্ত্রি হিসেবে, সে হয়তো একজন মালিক-চাষি। যে বছরে দুবার অন্যের কাছ থেকে জমি নিয়ে ভাগে চাষ করছে, সে হয়তো বছরে চারমাস রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজে মুম্বাই চলে যাচ্ছে।

কাজের ঘন্টা সম্পর্কিত ধারণাও এখানে খাটে না। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে যে সময়টা হাজার হাজার মানুষ এসে মেটেবুরুজের দলিজে কাম করে, তখন এরা যতটা পারে কামিয়ে নেয়। কারণ জানুয়ারি থেকে আগস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত দর্জিশিল্পের 'গয়ের মরসুম', তখন কাজ থাকে না। সেসময় অনেকে গ্রামে ফিরে গিয়ে চাষের কাজও করে। আবার বড়ো কারখানায় দেখুন। উত্তরপাড়ার হিন্দমোটর কারখানার ষাট বছর হয়ে গেল। এখনও সেখানে আনুমানিক ৫০% শ্রমিক গ্রামের সঙ্গে যুক্ত; অবাঙালি শ্রমিকদের ৯৫% গ্রামের সঙ্গে যুক্ত। মেটেবুরুজের কেশোরাম কটন মিল আরও পুরনো, এখানে গ্রামের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা আরও বেশি। কৃষি ও অ-কৃষির এই বিশাল মিশ্র জগতে এখনও রয়েছে যৌথ পরিবার।

সরকারি পরিসংখ্যান এখানেই ভণ্ডুল হয়ে যাচ্ছে। যতই নিবিড় গবেষণা চলুক না কেন, আসল প্রশ্ন হল, কোন দিক থেকে আমাদের এই দেশীয় কর্মজগতকে দেখা হবে? রাষ্ট্রের দিক থেকে, পুঁজির দিক থেকে, সরকারি সমাজের দিক থেকে — না, রাষ্ট্রেয়তর জগতের দিক থেকে, অ-পুঁজিবাদী জগতের দিক থেকে, বেসরকারি সমাজের দিক থেকে? প্রথম দিক থেকে দেখলে সংগঠিত শিল্পের দিক থেকে অসংগঠিতের বিচার হবে; শহরের দিক থেকে গ্রামকে দেখা হবে। এদিক থেকে দেখলে প্রথমেই আসবে চাকরি বা নিয়োগের প্রশ্ন। যে চাকরি করে না, তাকে বেকার বা স্বনিয়োজিতের খোপে ফেলা হবে। যাকে স্বনিয়োজিত বলা হচ্ছে, তার নিজস্ব বিশাল-বৈচিত্রময় জগতকে কর্মসংস্থানের আঁটোসাটো গণ্ডির মধ্যে বেঁধে ফেলার চেষ্টা হবে।

প্রতিরোধ ও পাশ কাটানো : পুঁজি বনাম গতর খাটা জগতের রাজনীতি

সম্প্রতি বড়ো বণিকদের সংগঠন অ্যাসোচ্যাম-এর ইকো পাল্‌স স্টাডি নামক এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে : জমি অধিগ্রহণ, জঙ্গল ও পরিবেশগত ছাড় ইত্যাদির পদ্ধতিগত সমস্যায় আটকে আছে তাদের যেসব প্রকল্প — যার মধ্যে রয়েছে ইস্পাত, বিদ্যুৎ ও গাড়ি নির্মাণের ১৮টি বড়ো প্রকল্প — তাতে ১,৬৪,০০০ মানুষ চাকরির সুযোগ হারাচ্ছে। এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, জমি-জঙ্গল-পরিবেশকে তার নিজস্ব জগতের দিক থেকে না দেখে চাকরির দিক থেকে দেখানোয় প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। যেমন, মন্দা বা সংকটও এসেছে চাকরি হারানোর দিক থেকে। চাকরি অবশ্যই একটা লোভনীয় বস্তু। এমনকী, স্বাধীনভাবে গতর খাটা পরিবারেও চাকরির কদর রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই কাজ বা চাকরিকেই বা আমরা কোন দিক থেকে দেখব?

শুরুতে যে প্রসঙ্গ আমি এনেছিলাম, অমিত ভাদুড়ির পূর্ণ কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। তিনি গ্রামীণ কর্মসংস্থানকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। গ্রামে সরকারের একশ দিনের কাজের প্রকল্পের সূত্রেই তাঁর ভাবনা রূপ পেয়েছিল, 'আত্মমর্যাদার সঙ্গে উন্নয়ন : পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষে'। তাঁর আলোচনায় কখনই সরকারি ভাষায় 'স্বনিয়োজিত'রা — আমরা যাকে স্বাধীন গতর খাটাদের জগৎ বলছি — আসেনি। তিনি নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের প্রসঙ্গ টেনেছেন বটে। কিন্তু সেখানে জনপ্রতিরোধের সবচেয়ে সক্রিয় শক্তি তো ছিল এই স্বাধীন গতর খাটাদের সমাজ। আমি তাঁর কাছে এই প্রসঙ্গ তুলেছিলাম। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'আমি ইনফর্মাল সেক্টর সম্পর্কে জানি না'। কিন্তু তিনি বলেছিলেন 'ট্রাডিশনাল নলেজ সিস্টেম'-এর কথা। এটাও বলেছিলেন, 'ট্রাডিশনাল এলাকায় উৎপাদন কম, কিন্তু কোন চাষি সেখানে আত্মহত্যা করেনি'। আত্মহত্যা কোন চাষি, কোন বেকার যুবক বা কোন ধনী ব্যবসায়ী করুক না কেন, আসলে সে তো সংকটের কাছেই আত্মসমর্পন করল।

আমরা যদি আগেকার মন্দা বা সংকটের পর্বগুলো দেখি, দেখা যাবে পুঁজি প্রত্যেক সংকটে অ-পুঁজির জগতকে গ্রাস করেছে আর তার মধ্য দিয়ে নিজের জগতের অচল অবস্থাকে ফের সচল করে তুলেছে। সেদিক থেকে মন্দা বা সংকট পুঁজিকে সরাসরি সংঘর্ষ থেকে পাশ কাটানোর সুযোগ করে দেয়। আগেকার সংকটে দেখা গেছে, পরিবেশের সঙ্গে পুঁজির সংঘাতমূলক সম্পর্ককে নতুন প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মধ্য দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। আজ জমি-জঙ্গল-জল বা প্রকৃতি-পরিবেশের অ-পুঁজির জগতকে যখন পুঁজি দখল করতে চাইছে, সেখানকার সমাজের দিক থেকে প্রতিরোধ আসছে। কিন্তু এই জনপ্রতিরোধ স্বল্পমেয়াদী। খেটে খাওয়া মানুষ ঠেকায় না পড়লে প্রতিরোধের পথ নেয় না। নিলেও বেশিক্ষণ তা স্বাধীনভাবে চালিয়ে যেতে পারে না। তারা জীবনের বেশিরভাগ সময় পাশ কাটিয়ে যেতে চায়। পুঁজির সঙ্গে, রাষ্ট্রের সঙ্গে, সিভিল সমাজের সঙ্গে রফা করে নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখে। পুঁজির বেঁচে থাকা মানে মুনাফার হার বাড়িয়ে চলা; ছোটো কারবারি, পেটি ওস্তাগর, হকার-ভেন্ডাররা বেঁচে থাকে যত কম মুনাফায় কিছু উপার্জন করে। পুঁজির সচল অবস্থায় যদি তারা এতে সফল হয়, তাহলে মন্দার সময়ও তা সম্ভব হতে পারে। বুদ্ধিজীবী ও তাত্ত্বিকেরা, আরও স্পষ্ট করে বললে, ভদ্রলোকেরা অনেক সময় রাষ্ট্র বা পুঁজির সঙ্গে আপসরফায় একটা যোগসূত্র (কখনও বা মধ্যস্থতাকারী) হিসেবে কাজ করে। ট্রেড-ইউনিয়ন, পার্টি বা এনজিও-র ভূমিকাও আদতে তাই। সেখানে যেটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কোনদিক থেকে দেখা হচ্ছে, কার নজরে দেখা হচ্ছে।

পাঠকদের প্রতি

পত্রিকা সম্পর্কে আপনার মতামত পাঠান। লেখা, মতামত, পরামর্শ পাঠানো সহ সমস্ত যোগাযোগের ঠিকানা

জিতেন নন্দী

বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, ডাক: বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮

দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : jiten_nandi@vsnl.net

'নতুন নেপাল' এবং বৃহত্তর প্রেক্ষিতের প্রসঙ্গ

স্টিফেন মাইকসেলের সঙ্গে আলাপ

আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে নৃতত্ত্ববিদ স্টিফেন মাইকসেল আমেরিকা থেকে নেপালে আসেন গবেষণার কাজে। পশ্চিম নেপালের এক বণিক কৌম 'নেওয়ার'-দের উত্থান নিয়ে তিনি কাজ করেন। কিন্তু ক্রমে নেপালের সমাজ ও আন্দোলন তাঁর অধ্যয়নের বিষয় হয়ে ওঠে। তিনি সেই বিষয়ে লেখেন একটি বই, 'ক্লাস, স্টেট অ্যান্ড স্ট্রাগ্‌ল ইন নেপাল'। 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি'-র ১০ মে ২০০৮ সংখ্যায় নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)-র নেতা বাবুরাম ভট্টরাইয়ের সঙ্গে তাঁর এবং মেরি ডেসশেন-এর সাক্ষাৎকার পড়ে তাঁকে আমরা কিছু প্রশ্ন করি। ইতিমধ্যে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নেয় কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)-র মুখপত্র 'রেড স্টার'। তিনি আমাদের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত জবাব দেওয়ার পর কলকাতায় ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ আমরা তাঁর সঙ্গে আরও কিছুটা বিশদে তাঁর পর্যবেক্ষণ ও ভাবনাচিন্তা নিয়ে কথা বলি।

'ফর এ নিউ নেপাল' শিরোনামে বাবুরাম ভট্টরাইয়ের সেই সাক্ষাৎকার হয়তো অনেকে পড়েছেন। যে নতুন নেপালের স্লোগান মাওবাদীরা তুলেছিল 'সাংবিধানিক সভা'র নির্বাচনের আগে, যে পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেওয়ার জন্য তারা নেপালের জনসাধারণকে আহ্বান করেছিল, তারই এক বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে স্টিফেন মাইকসেলদের প্রশ্নে। বাবুরাম ভট্টরাই বলেছিলেন, তাঁরা চান নিচের তলার জনসাধারণ সরকারের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করুক, সংবিধান তৈরিতে অংশ নিক। স্টিফেনরা বারবারই প্রশ্ন তুলেছিলেন, কী সেই উপায় (means) বা সংগঠন যা দিয়ে জনসাধারণ এই কাজ করতে পারে? বাবুরাম ভট্টরাই উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমরা কিন্তু তার নির্দিষ্ট ধরনটা খুঁজে পাইনি। সরকার যদি বিপথে যায়, কীভাবে তার ওপর হস্তক্ষেপ করা হবে? জনসমাবেশ ছাড়া আর কীভাবে চাপ দেওয়া হবে? কীভাবে জনসাধারণ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করবে? আমরা তার কল-কব্জা খুঁজে বার করার চেষ্টা করছি।' এছাড়া তিনি স্বীকার করেছিলেন, 'আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার আভ্যন্তরীণ সম্পদকে কাজে লাগানো। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আশু অর্থে, আমাদের কিছু বিদেশি পুঁজি দরকার। অন্তত দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য, প্রাথমিক পরিকাঠামো এবং আরও কিছু ক্ষেত্রে আমাদের আন্তর্জাতিক পুঁজি ব্যবহার করে বিনিয়োগ করতে হবে।' আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র অভিমুখী শিল্প-পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটানোর কথাও তিনি বলেছিলেন। সাম্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রে শ্রমিকশ্রেণীর শাসন যদি তত্ত্বগতভাবে সঠিক হয়, তাহলে পার্টি-নীতি ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ট্রেড-ইউনিয়নের কী ভূমিকার কথা তাঁরা ভাবছেন? এই প্রশ্নের জবাবে ভট্টরাই স্বীকার করেন, 'আমরা ফ্যাকট্রিতে [শ্রমিকদের] রাজনৈতিক ক্ষমতা হিসেবে সংগঠিত করতে পারিনি'।

নেপালে ক্ষমতাবদলের এই পটভূমি থেকে স্টিফেন মাইকসেলের সঙ্গে আমাদের সংলাপ শুরু হয়েছে। 'রেড স্টার'-এর সঙ্গে তাঁর আলাপেও সেই বৃহত্তর প্রেক্ষিতের প্রসঙ্গই এসেছে। আমাদের সংলাপের সঙ্গে তারও অনুবাদ আমরা প্রকাশ করলাম। ইংরেজি থেকে পুরো সংলাপের অনুবাদ করেছেন শমীক সরকার এবং অমিতাভ সেন।

সত্যিকারের সংগ্রামের সবে শুরু

রেড স্টার, ১৯-৩০ জুন ২০০৮

স্টিফেন মাইকসেলের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন নেপালের মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে রোশন কিসুন।

প্রঃ আপনি নেপালে আপনার কাজ সম্পর্কে এবং একজন বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা প্রসঙ্গে আপনার কী দৃষ্টিভঙ্গী সে বিষয়ে কিছু বলুন।

উঃ ১৯৮৫ সালে আমি নেপালে কাজ শুরু করি। আমি পশ্চিম নেপালে একটা সমীক্ষা চালিয়েছিলাম।। আমার বিষয় ছিল সেখানে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উত্থান, তারা কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং সম্প্রদায়ের মাধ্যমে, ঔপনিবেশিক ভারত থেকে ব্রিটিশ পুঁজির যে প্রসার নেপাল পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল, সেই সম্প্রসারণে অংশগ্রহণ করেছিল, তা বোঝা। তাছাড়াও, ব্যবসায়ীরা গ্রামাঞ্চলে একটা শ্রেণী হিসেবে কী করে গড়ে উঠল এবং কীভাবে ব্যবসায়ীদের বাজার নামক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তারা জমি ও অন্যান্য উৎপাদক সম্পত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করল, তাও আমার বিচার্য ছিল। আমি অন্যান্য জিনিস নিয়েও কাজ করেছি, যেমন রেডিও, এবং 'এভারেস্ট হেরাল্ড' যখন প্রথম কাজ শুরু করে তখন প্রায় ছ'মাস আমি তাদের বার্তা সম্পাদক ছিলাম। নেপালের আন্দোলনে সংগ্রাম কীভাবে বিকশিত হচ্ছে তাও আমার নজরে রেখেছি।

বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার প্রসঙ্গে বলি, আমি খুব বিশ্বাস করি যে বুদ্ধিজীবীরা হাত নোংরা করেই রাখে। আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমি বাগান করি ও বাড়ি বানাই। এবং আমি এখন শিখছি কীভাবে কাদামাটি এবং খড় দিয়ে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক বাড়ি বানানো যায়, যে বাড়ি সিমেন্টে তৈরি বাড়ি থেকে আরামপ্রদ তো বটেই, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে যে গাদা গাদা বাড়ি তৈরি হয়েছে সেগুলোর থেকেও ভালো। আমি অনেক কৃষি আন্দোলনের সাথেও যুক্ত হয়েছি। আমি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে আমার সাইকেল চেপে ঘুরে স্বভাবজ কৌমগুলিকে প্রত্যক্ষ করেছি — এগুলো জনগণের তৈরি সমবায় (কমিউন) — আমি মনে করি এগুলো সমাজতন্ত্রের আরেক রূপ; যদিও এগুলো খুবই ছোটো ছোটো ও বিচ্ছিন্ন এবং রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য কোনও লড়াইয়ে জড়িয়েও নেই। অন্ততঃ তখন ছিল না। আমি মনে করি যে বুদ্ধিজীবীদের উৎপাদক কাজকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা উচিত, শুধু হাতে একটা কলম ধরলেই চলবে না।

প্রঃ মার্কসবাদ সম্পর্কে আপনার বোঝাপড়া এবং কীভাবে মার্কসবাদকে দেখেন সে বিষয়ে কিছু বলবেন কি?

উঃ আমার নিজের পাঠ গ্রহণ করার সময় আমি মার্কসবাদে প্রবেশ করি নৃতত্ত্ব মারফত। কাজেই আগেই জনগণের সাথে সরাসরি মেলামেশা করার শিক্ষা আমার হয়েছিল। নৃতত্ত্বে বলছে, আগে জনসাধারণের সঙ্গে মাসের পর মাস থাকো, তারপরে তুমি বিচার বিশ্লেষণ গবেষণার কাজ শুরু করো। তাই গবেষণার বিষয় হবে সেই জনসমষ্টি যাদের সাথে তুমি ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছো। তাই মার্ক্সবাদে আমি যখন প্রবেশ করি তখন তার পরিচয় হয়েছে আমার নৃতত্ত্বের হাত ধরে এবং সঠিকভাবে মার্ক্সবাদে প্রবেশ করি মার্ক্সের নিজস্ব লেখা পড়ার মধ্যে দিয়ে। কোনও টীকাকার বা ব্যাখ্যাকারের সাহায্যে নয়, আমি 'গ্রুন্ডরিস' থেকে পড়া শুরু করি কারণ এখানেই মার্ক্স নৃতাত্ত্বিক ভাবনা নিয়ে আলোচনা চালিয়েছেন। তারপর আমি 'ক্যাপিটাল' পড়ি এবং সেখান থেকে আরো এগোই। আমি আবার নৃতত্ত্বে ফিরে আসি আরো বেশি তথ্য সমৃদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। যাইহোক, এইভাবে আমার মার্কসবাদ পড়া। আমার কাছে মার্ক্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী। যেখানে আপনি খুব নিবিড়ভাবে দেখছেন জগৎটা কী, জগৎকে আপনি একটা ধারাবাহিক সৃষ্টি হিসেবে দেখছেন। এর দুটো দিকই খোলা — কোনদিকে এ যাচ্ছে এবং সেটা নির্ধারিত হচ্ছে কোথা থেকে এটা এসেছে সে ব্যাপারে আপনার ব্যাখ্যার ওপরে।

প্রঃ আপনি কখন থেকে রাজনৈতিক কাজকর্মের সাথে যুক্ত?

উঃ ১৯৬০ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যখন বড়ো ধরনের ঔপনিবেশিক যুদ্ধে লিপ্ত হলো তখন দেশের সব যুবককেই সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু হল। আমিও সেই টানাটানির মধ্যে পড়ে গেলাম। আমরা এসেছি 'কোয়েকার' সংগঠন থেকে, আমাদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীও যুদ্ধবিরোধী। ফলে আমাদের পরিবার ছিল যুদ্ধবিরোধী। সাথে সাথে আমিও তাই এবং আমরা তখন অনেক যুদ্ধবিরোধী মিছিল এবং বিক্ষোভে যোগ

দিয়েছিলাম। যুদ্ধ মিটে যাওয়ার পর অনেকেই সংগ্রাম-আন্দোলন থেকে দূরে সরে গিয়ে অন্যকিছু শুরু করল। আমি যখন নৃতত্ত্ব পড়তে শুরু করলাম তখন একদল মার্কসবাদী নৃতাত্ত্বিক আমাকে খুব প্রভাবিত করল। তারপর আমি নেপালে এলাম — এখানে যেহেতু একটা দীর্ঘ লড়াই চলছিল, তাই এই দেশটা আমাকে খুব আকৃষ্ট করল।

প্রঃ আপনার কাজের মধ্যে দিয়েই এমন কোনও চিন্তা আপনার এসেছে যাতে মনে হয়েছে যে এই এই জিনিসগুলো নেপালের জনগণের জানা বা বোঝা দরকার ?

উঃ আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে নেপালের উন্নয়ন বা বিকাশ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, কিন্তু সেই কথাগুলো কতটা সামগ্রিক ভাবনা চিন্তার ওপরে দাঁড়িয়ে হয়েছে? আমার নিজের কাজ থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, যেসব সমাজগুলোকে আমরা 'উন্নত' বলি সেগুলো পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, যেমন সৌরশক্তির ওপর বেশি বেশি করে নির্ভর না করে পেট্রোলিয়ামের শক্তিতে চলছে। তাই সমাজগুলো উন্নত বা অনুন্নত না বলে, আমার মতে বলা উচিত, সৌরশক্তির ভিত্তিতে চালিত সমাজ বা পেট্রোলিয়াম-শক্তির ভিত্তিতে চালিত সমাজ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই পৃথিবীতে সৌরশক্তির ভিত্তিতে চালিত সমাজগুলোকে কম মূল্য দেওয়া হয়েছে। যদিও তাদের হাজার হাজার বছরের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ও প্রচণ্ড কুশলতা আছে। যেখানে শিল্পসমাজ সমস্তরকম মানবিক কাজকর্মকে ছেঁটে ফেলে, পেট্রোলিয়াম-শক্তির ক্ষমতায় সব চালিয়ে যাচ্ছে। যা এখন তার শীর্ষক্ষমতায় আছে এবং পরবর্তী চল্লিশ বছরে যা ক্রমেই নিম্নমুখী হবে এবং আমাদেরকে প্রাক্-পেট্রোলিয়াম যুগের অবস্থায় পৌঁছে দেবে। আমার মতে যে সমাজ ভবিষ্যতের কথা ভাবছে সে সৌরশক্তির ব্যবহারের পদ্ধতি কী করে আরো বাড়ান যায় সেই কথাও ভাবছে। এবং এই বিষয়ে নেপালের প্রচুর জ্ঞান আছে, সারা পৃথিবীতেও এই জ্ঞান ছড়িয়ে আছে। এটাও একটা বিষয় যা বোঝা দরকার — এরকমই নানা ভাবনা আমার আছে।

প্রঃ ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও বিপদ সম্পর্কে আপনি কী ভাবছেন?

উঃ আমার মনে হয় নেপালের একটা সর্ববৃহৎ বিপদ হল এই দেশ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক-অর্থনীতির থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সেখান থেকে কিছু বার করে আনা একটা চ্যালেঞ্জের কাজ, যার জন্যে জনগণকে প্রচণ্ড স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে কাজকর্ম করতে হবে এবং এর জন্য তাদেরকে অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। আমার মনে হয় এটা বিপদ যে সাধারণ মানুষকে অনেক কিছু ছেড়ে দিয়ে এক স্বনির্ভর জীবনযাপন করতে হবে। আরেকটা বিপদ হল পার্টির আমলাতন্ত্র। নতুন নেপালকে যদি এমনভাবে গঠিত করা হয় যে তা দলগুলোর নেতৃত্বে চলবে; তাহলে কি দলগুলোর বিকাশ উদ্দেশ্য ও কর্মের যে সংগ্রাম তা দলগুলোর অধীনে থাকবে? অথবা পার্টিগুলোকে কর্ম-সংগ্রামের একটা যন্ত্র হিসেবেই দেখা হবে, সার অংশ হিসেবে নয়? ঊনবিংশ শতক থেকে পার্টিগুলো নিজেদের সাথে বহু তল্পিতল্পা বয়ে নিয়ে আসছে। এই হল দুই বিপদ।

প্রঃ আপনি স্বাধীন শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ওপর জোর দেন। এ বিষয়ে কিছু বলবেন?

উঃ আমার মনে হয় কখনও কখনও সংগ্রামকে আশু বিষয় হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে ফিরে গেলে দেখা যায় যে সবসময়ই জাতকে সৃষ্টি করার একটা প্রক্রিয়া চালু রয়েছে এবং সেই জন্যই ঐতিহাসিকভাবে শ্রেণীসংগ্রামের সৃষ্টি হয়েছে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দিয়ে, যারা ওই সমাজেই বিকশিত হয়ে নিজেদের দরকারেই বিভিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়েছে এবং ধীরে ধীরে ওই প্রক্রিয়াগুলোর ওপর আরো আরও নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়েছে।

সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যে দুনিয়ার জন্য আমরা সংগ্রাম করছি সেই দুনিয়াকে আমাদের সৃষ্টি করতে হবে; এমন কথা কখনোই না ভাবা যে আমরা গণতন্ত্র বা সাম্যবাদের জন্য লড়ছি এবং একদিন আমরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করব এবং সাম্যবাদ পেয়ে যাব। আমার মনে হয় না ব্যাপারটা এইভাবে হয়, তোমার লড়াইয়ের মধ্যে যদি সেটা না থাকে যেটা তুমি চাইছো, তাহলে রাষ্ট্রক্ষমতা তোমার নিয়ন্ত্রণে আসার পরে খুব সহজেই তা এমন এক জায়গায় গিয়ে শেষ হবে যা সম্পূর্ণ আলাদা, এবং যা বহু শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবেই ঘটেছে। যেমন, চীন আজ যথেষ্ট পুঁজিবাদী, সোভিয়েত রাশিয়াতে আমরা দেখেছি সামাজিক আন্দোলনের ভয়ানক আমলাতন্ত্রীকরণ। তাই জনসাধারণের মধ্যে আমাদের এমন সব পন্থা সৃষ্টি করা প্রয়োজন যাতে সরাসরি ক্ষমতা দখল তারা করতে পারে। কাজেই আমার কাছে সংগ্রামের জোর পড়বে পদ্ধতির ওপর যা আমাদের সবসময় খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে এবং এই পদ্ধতির মধ্যেই যা থাকবে তা সৃষ্টি করার সংগ্রামেই মূল জোর পড়বে।

স্টিফেন মাইকসেল উত্তর দিয়েছেন জিতেন নন্দীর বিভিন্ন প্রশ্নের

প্রঃ বর্তমান অবস্থায় নেপালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কর্মসূচীর ভবিষ্যৎ কী? বিশেষত সামরিক প্রশিক্ষণ, 'অফিস অফ ডিফেন্স কো-অপারেশন'-এর কাজকর্ম বিষয়ে?

উঃ এই মুহূর্তে নিশ্চিতভাবে আমি এ বিষয়ে বলতে পারব না। তবে অন্যান্য সেনাবাহিনী যারা আমেরিকার গ্রহীতা তাদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি যা করে থাকে অথবা নিজেদের স্বার্থকে আঞ্চলিকভাবে আরও বাড়ানোর জন্য যা করে থাকে, সেই হিসেবে বলতে পারি, তারা পুরনো সম্পর্কগুলিকে আরো বিকশিত করার চেষ্টা করবে। যেমন প্রাচীন রোম, একবার সাহায্যের জন্য এলে আর ফিরে তো যায়ই না, বরং নিজেদের প্রভাব ও উপস্থিতির আরো বিস্তার ঘটানোর চেষ্টা করে। আমি জানি, আমেরিকা ১৯৮০ এবং ১৯৯০–এর দশকে এখানকার মিলিটারি অফিসারদের আমেরিকা নিয়ে গিয়ে প্রতি-অভ্যুত্থানের প্রশিক্ষণ শিবিরে এবং অন্যান্য সামরিক ঘাঁটিতে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল।

প্রঃ আপনি প্রশ্ন তুলেছেন যে নেপালে যে প্রক্রিয়া চলছে সেখানে হস্তক্ষেপের জন্য জনগণের উপায় বা সংগঠন কীরকম হবে। ভেনেজুয়েলাতে আমরা 'কমিউনাল কাউন্সিল'-এর মধ্যে তার একটা রূপ দেখেছি। নেপালে কি সেরকম কিছু চোখে পড়ছে? অন্তত সিপিএনএম–এর ঘাঁটি বা মুক্তাঞ্চলগুলোতে?

উঃ যেসব জায়গাগুলোকে মুক্তাঞ্চল বলা হচ্ছে সেখানে আমি যাইনি। তবে আমি যা জানি তাতে ওইসব অঞ্চলের কাউন্সিলগুলো সিপিএনএম-এর অধীন। ভেনেজুয়েলা বা দক্ষিণ আমেরিকার অন্যত্র যে কাউন্সিলগুলো গড়ে উঠেছিল, ওখানে আমেরিকার দালাল রাষ্ট্রগুলো রাজনৈতিক কাজকর্মের ওপর চরম দমন-পীড়নের মাঝে যে ফাঁকা জায়গা রেখেছিল, সেখানে। আমি শুনেছি ওখানে কাউন্সিলগুলো প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর নিদারুণভাবে ক্ষয়ে গেছে। আমার ধারণা, যা আমি এখানে গ্রামগুলোতে গিয়ে দেখেছি তাতে দারুণ সম্ভাবনা আছে। যেহেতু বেশিরভাগ পুরুষ কাজের জন্য বিদেশে বা শহরে গিয়ে থাকে, তাই সাধারণভাবে গ্রামগুলোতে মহিলারাই মূল শক্তি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দালালরা এই শক্তিকে নির্বাচনী রাজনীতিতে আটকে রাখতে চায়। সম্ভবত রাজনৈতিক নেতারা ও দলতন্ত্র, যদি সত্যিকারের জনশক্তির বিরোধী না বলি, তাহলে বিরূপ বলা যায়, কারণ

জনতা যদি সত্যিই উদ্যোগী হয়, তাহলে ক্ষমতা নিচের মহলে চলে যাবে এবং তারা ক্ষমতা হারাবে।

প্রঃ আপনার সাক্ষাৎকারে আপনি জাতিসত্তা বা কৌমগুলিকে নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। আমার মনে হয় এই প্রশ্ন এবং জাতির স্ব-নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন আগামী দিনে উঠবে। এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করুন।

উঃ আমাদের অনেক কিছু করার ছিল। মাওবাদীরা জনজাতি বা জাতীয় বিষয়গুলো শুধু তাদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগিয়েছে এবং তাদের দলভুক্ত করে পার্টির অধীনে রাখার চেষ্টা করেছে। এখন মনে হয় এই জনজাতি সংগঠনগুলো নিজেরা শক্তি অর্জন করছে এবং নিজেদের স্রষ্টার বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। আমার বিচারে, বহুজাতিকদের কর্তৃত্বের এই দুনিয়ায়, জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ একটা দৃষ্টিভ্রম এবং আরো বড়ো কথা এটা জাতিরাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্রের কোনও পরিবর্তন ঘটায় না বা বহুজাতিকদের আগ্রাসী শাসনের বাড়বাড়ন্তকে কোনও রকম চ্যালেঞ্জ জানায় না, সাধারণভাবে উন্নয়ন ইত্যাদির নাম করে একে অপরের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে, কিন্তু স্থানীয়ভাবে একই ভাষাভাষি জনসাধারণের ওপর আধিপত্যকারী শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ঘটায়। জাতিরাষ্ট্রের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি একটা পুরাকথা এবং ক্ষমতার জোট বাঁধার বিচারে এটা কখনোই বাস্তব সত্য ছিল না। এর বদলে আমি চাই আঞ্চলিক উদ্যোগ, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পরিচালনা।

প্রঃ নেপালে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে পুঁজির অনুপ্রবেশ এড়ানো যায় না। আমি জানতে চাই সমাজের প্রয়োজন কী তা প্রকাশ করা ও তা নিয়ে লড়াই করার জন্য খেটে খাওয়া মানুষের কতটা শক্তিশালী সংগঠন আছে? চালু ট্রেড ইউনিয়ন এবং পার্টিগুলো এই ভূমিকা নিতে পারেনা বলেই আমার মনে হয়। আপনার কী মত?

উঃ নেপালে ট্রেড ইউনিয়নগুলো খুবই শক্তিশালী। কিন্তু গোটা দেশ যখন রাজপ্রাসাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল তখন তারা সেই শক্তি দেখাতে পারেনি। কারণ, সেগুলো পার্টিগুলোর অধীন এবং পার্টিগুলোর বিভিন্ন লাইন অনুযায়ী তারা ভাগ হয়ে গিয়েছিল। আমি আপনার সাথে একমত যে, চালু ট্রেড ইউনিয়নগুলো, এমনকি চালু পার্টিগুলোও, সমাজে কিছু ভূমিকা পালন করলেও, শ্রেণীসংগ্রামে কোনও উল্লেখযোগ্য বড়ো রদবদল ঘটাতে পারবে। নেপাল সহ সবজায়গায়, একদম তৃণমূল স্তরে এমন সব সংগঠন গড়ে তোলা দরকার যাতে সাধারণ মানুষ নিজেদের কাজ বেশি বেশি করে নিজেরাই পরিচালনা করতে পারে — এটাই আমার অনুভব।

এটাকে আপনি সরাসরি গণতন্ত্র বা মৌলিক গণতন্ত্র (ডাইরেক্ট অর র‍্যাডিক্যাল) বলতে পারেন।

প্রঃ শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর ভাবনা বা কাজকর্ম কী? মুক্তাঞ্চলগুলোতে অন্তত কোনওরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে কি?

উঃ আমি যতদূর জানি তাতে শিক্ষা নিয়ে তেমন কোনও পরীক্ষামূলক কিছু হয়নি। আমার মনে হয় মাওবাদীরা কিছু বুলি আওড়ে যাওয়াতেই বেশি ব্যস্ত ছিল। যদিও এটা হয়তো যুবশক্তিকে উদ্যোগী করেছে, কিন্তু পুরনো ব্যবস্থার বুলি কপচানোতে কোনও পরিবর্তন আনতে পারেনি। একটা বিমূর্ত শিক্ষাসূচী বা আদর্শের পরিবর্তে স্কুলব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে, জনসাধারণের যেমন যেমন পরিস্থিতি, অবস্থা বা সমস্যার মুখোমুখি পড়ছে সেই অনুযায়ী শুরু করে নানারকম ভাবনায় ও কাজে নিযুক্ত করার মাধ্যমে শিক্ষাদান করার পক্ষেই আমার মত।

স্টিফেন মাইকসেলের সঙ্গে শমীক সরকার ও জিতেন নন্দীর আলাপ

জিতেন : রেড স্টারে আপনার যে সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছিল ... তাতে কিছু প্রশ্ন ছিল, খুব প্রয়োজনীয়। যেমন, বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা। আমি এখনও খুঁজছি, বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা কী হওয়া উচিত, সেটা।

স্টিফেন : আমিও। কার্যত, আমি একটা উদ্যোগ নিচ্ছি, একটা নতুন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় খোলার। যা গ্রামভিত্তিক। যেখানে শিক্ষার বেশিরভাগটাই আসবে গ্রামের মানুষের কাছ থেকে। কারণ আমার মনে হয় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, সে আমেরিকা হোক আর অন্য জায়গার, তা মানুষকে এই একবিংশ শতকের জন্য তৈরি করতে পারছে না। এই শতকে আমাদের তেলের ভাঁড়ার ফুরিয়ে যাচ্ছে। আরও অনেক পরিবর্তনের ধাক্কা আসতে চলেছে। আমাদের বাচ্চারা বিংশ শতকের, কখনও বা যেন ঊনবিংশ শতকের পৃথিবীর জন্য শিক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু তাদের একবিংশ শতকের জন্য শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। একবিংশ শতকে তেল শেষ হয়ে যাবে আর আমাদের এই শহর, বড়ো বড়ো শহরগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে ওই পেট্রোলিয়ামের ওপর।

জিতেন : এটা আমাদের তথাকথিত উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত।

স্টিফেন : প্রফেসর উইলিয়াম চেম্বারলিন এই উন্নয়ন কথাটা ব্যবহার করেন না। বলেন বাণিজ্যিকীকরণ বা কমার্শিয়ালাইজেশন। তিনি এখনও বেঁচে আছেন। এবং বলা যায়, সোলার ভিত্তিক সমাজ না পেট্রোলিয়াম ভিত্তিক সমাজ। পেট্রোলিয়াম ভিত্তিক সমাজ প্রকৃতির ওপর সমস্ত কিছু করতে পারে তেল আহরণের জন্য, আর এর ভিত্তিতে সে আমাদের সাথে প্রকৃতির সাথে যে জটিল সম্পর্ক, তা ধ্বংস করে। আমরা সম্পূর্ণভাবে পেট্রোলিয়ামের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ি। আমার বিশ্বাস, আমাদের সমস্ত ধরনের দক্ষতা, জ্ঞান এবং আকর রয়েছে পেট্রোলিয়ামের পূর্বে আমরা যা নিয়ে বাঁচতাম, সেখানে ফিরে যাবার জন্য।

জিতেন : আমেরিকায় হয়তো এটার চর্চা চিন্তার জগতেও করা সম্ভব। কিন্তু নেপালে পরিস্থিতি আলাদা। আমি সেখানে দেখেছি, দেশটার একটা বড়ো অংশে কোনও মোটরগাড়ির জন্য রাস্তা নেই। তাই সেখানে পেট্রোলিয়ামের ওপর নির্ভরশীলতা একটা বড়ো অংশের স্বাভাবিকভাবেই নেই।

স্টিফেন : হতে পারে। কিন্তু নেপালের গ্রামগুলি থেকে প্রচুর মানুষ, ছেলেরা এবং মেয়েরা শহরে কাজে আসছে। তাই সেখানে শহর এবং গ্রামের মধ্যে একটা পারস্পরিক নির্ভরশীলতা আছে।

শমীক : কেন এই মাইগ্রেশন?

স্টিফেন : আমি আমার গবেষণার কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, নেপালে বহুদিন ধরে গ্রামগুলিতে 'মার্চেন্ট ক্যাপিটাল'-এর পেনিট্রেশন আছে। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই মনে হয় এর সূচনা।

শমীক : তা কি ভারতীয় পুঁজি?

স্টিফেন : এটা ব্রিটিশ এম্পায়ারের সাথে যুক্ত। তবে ভারতেও যেমন প্রচুর স্থানীয় ব্যবসায়ী কাজ করেছে বা করে, তেমনি নেপালেও প্রচুর স্থানীয় ব্যবসায়ী কাজ করে।

জিতেন : এরা কি কোনও নির্দিষ্ট কৌমের সাথে যুক্ত?

স্টিফেন : হ্যাঁ। নেওয়ার-দের সাথে। এরা কাঠমাণ্ডুর। আমি কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, এরা আস্তে আস্তে কাঠমাণ্ডু থেকে গোটা নেপালে ছড়িয়ে পড়েছে, গ্রামে গ্রামে এবং তারপর সেখানকার জমি-জায়গার মালিক হয়ে বসেছে। ছোটো ছোটো শহর বা গ্রামের বাজারগুলোর বড়ো শক্তি হয়েছে, আর তীর্থস্থানগুলোতেও এরা কাজ করে। এরা একটা ১০০ কিমি জায়গা

জুড়ে কাজ করে। ছোটো ছোটো বাজার, দোকানজুড়ে। আর এভাবেই এরা গ্রামগুলিকে নিয়ন্ত্রণও করে। ১৯২০ সালের মধ্যেই ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় বস্ত্র তৈরির ব্যাপারটি ধ্বংস হয়ে যায়। সবাই ঋণে জড়িয়ে পড়ে ওই মার্চেন্টদের কাছে। এটা আমার মনে হয় গোটা নেপাল জুড়েই ঘটেছে। তাছাড়াও গ্রামে জমিদারদের সমস্যা আছে। তাই অনেকেই নতুন সুযোগ খুঁজেছে গ্রামের বাইরে গিয়ে।

শমীক : সুযোগ মানে?

স্টিফেন : টাকাকড়ি। মাঝে মাঝে গ্রামগুলিতে একটা ডেসপারেট অবস্থা তৈরি হয়। গত তিরিশ বছরে গ্রামগুলিতে পুঁজিবাদী সম্পর্ক অনেক বদলেছে। আগে গ্রামবাসীদের সাথে মার্চেন্ট বা জমিদারেরও একটা স্থানীয়, ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। এটা জেনেই যে তারা গ্রামের মানুষকে শোষণ করছে। অনেক সময় মানুষ ডেসপারেট অবস্থায় তাদের কাছে চলে যেতে পারত। কিন্তু এখন সে সব সম্পর্কেরও অনেক বাণিজ্যিকীকরণ বা কমার্শিয়ালাইজেশন হয়েছে। তখন মানুষ গ্রাম ছেড়ে যাচ্ছে শহরে অর্থের সন্ধানে। আমি এরকম গ্রামের কথা জানি, যেখানে সমস্ত পুরুষ চলে এসেছে শহরে। মেয়েরা কেবল গ্রামে আছে। পুরুষরা গ্রামে অর্থ নিয়ে আসছে। আর একটা ব্যাপার হল গ্রামের স্কুল-ব্যবস্থা। গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটার গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। তাই এই শিক্ষাব্যবস্থায় যারা শিক্ষিত হচ্ছে, তারা গ্রামে আর তাদের কোনও জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। স্কুলগুলো তাদের শিক্ষার মধ্যে দিয়ে কমবয়সীদের যোগ্য করে তোলার বদলে অযোগ্য করে তুলছে।

জিতেন : নেপালে কি কোনও ঐতিহ্যগত স্কুল আছে?

স্টিফেন : হ্যাঁ, আমি আমার বৌয়ের কাছে শুনেছি, তারা ঐ ধরনের ব্রাহ্মণদের চালানো স্কুলে পড়েছে। তাছাড়াও বাচ্চারা ছোটবেলা থেকে শেখে চাষের কাজ, ঘরের কাজ। এমনকি আমার দেখাশোনাও তো গ্রামে গেলে বাচ্চারাই করে। এইগুলোর ভালো সম্ভাবনা আছে।

জিতেন : আপনি যে বুদ্ধিজীবির ভূমিকা কী তা খুঁজেছেন বললেন, তা কি একটা স্থানীয় প্রকল্প নাকি এর একটা গ্লোবাল বিস্তার আছে?

স্টিফেন : না না। আমি স্থানীয়ভাবে কাজ করি, কিন্তু গ্লোবাল কনটেক্সট-এ। আমরা গ্রামভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় বানানোর চেষ্টা করছি।

শমীক : সারনাথে একটা এই ধরনের প্রকল্প আছে। লোকবিদ্যার প্রকল্প। সুনীল সহস্রবুদ্ধেরা তৈরি করেছেন 'বিদ্যাশ্রম'।

জিতেন : ওরা যে কনসেপ্টটার ওপর কাজ করে সেটাকে বলে নলেজ ট্র্যাডিশন, ট্র্যাডিশনাল নলেজ নয়।

স্টিফেন : আমি অবশ্য এই ট্র্যাডিশন কথাটার ক্রিটিক। হতে পারে সেটা পুরনো একটা কিছু, কিন্তু নৃতত্ত্ববিদ্যার চোখ দিয়ে দেখলে ট্র্যাডিশন কথাটার মধ্যে দিয়ে ইতিহাসকে আউট অফ কনটেক্সট, আউট অফ পিপল দেখা হয়ে যায়। আমি ওই মার্চেন্ট গ্রামগুলিতে দেখেছি মানুষ পরিবর্তনকে ইতিহাসের মধ্যে থেকেই নিচ্ছে। ইতিহাসের মধ্যে তারা সম্পৃক্ত। এই গ্রামগুলিকেও তারা তৈরি করেছিল বিভিন্ন জায়গা থেকে ঘুরে ঘুরে এসে। বিভিন্ন মাইগ্রেন্ট গ্রুপ বিভিন্ন গ্রাম তৈরি করেছে।

শমীক : এই কনটেক্সট-এর ওপর দাঁড়িয়ে মাওবাদী পার্টির নেতৃত্বে যে আন্দোলন তাকে আপনি কীভাবে দেখেন? মানে, কী সেই সামাজিক ডায়নামিক যা এই আন্দোলনকে তৈরি করল?

স্টিফেন : আসলে নেপালের গ্রামগুলিতে একটা ডেট-বন্ডেজ (ঋণের বন্ধন) ব্যবস্থা রয়েছে। এটা ঠিক স্লেভারি বা সার্ফডম নয়। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ, এমনকি যারা সুপ্রতিষ্ঠিত, তাদেরও ঋণ রয়েছে। মার্চেন্টের কাছে। এজন্য একটা এক্সপ্লয়টেশনের সেন্স রয়েছে মানুষের মধ্যে। এছাড়া এই শিক্ষার প্রসারের কারণে মানুষের মধ্যে অন্যান্য সম্ভাবনা সম্পর্কে একটা ধারণাও তৈরি হয়েছে। গ্রামে গ্রামে মানুষের মধ্যে একটা যোগাযোগ তৈরি হয়েছে। একটা স্টাডি করতে গিয়ে আমরা দেখেছিলাম, ইউএস এইড-এর লিটারেসি প্রোগ্রাম যেখানে চলেছে, সেখানে এই আন্দোলনের একটা বড়ো ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। মাওবাদী আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ হয়েছে।

জিতেন : মহিলাদের অংশগ্রহণ?

স্টিফেন : হ্যাঁ। একটা জায়গায় ইউএস এইড মহিলাদের সাক্ষরতা প্রোগ্রাম করছিল। তারা ভাবতেও পারেনি, হয়তো চায়ওনি, সেই জায়গার মহিলারা সবাই মাওবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়ে দিল। আমার মনে হয় এটা একটা আনএক্সপেক্টেড বাইপ্রোডাক্ট।

জিতেন : এই লিটারেসি প্রোগ্রামের সংগঠক কি একটা এনজিও না একটা এনজিও নেটওয়ার্ক?

স্টিফেন : আমার মনে হয় ইউএস এইড সাপোর্টেড একটা এনজিও (নাম মনে নেই) সারা নেপালে এই সাক্ষরতা কর্মসূচিটা চালায়। তারা বলে যে তারা পাওলো ফ্রেইরির শিক্ষানীতি মেনে চলে। কিন্তু তারা টেক্সটবুক ব্যবহার করে, যা ফ্রেইরির শিক্ষানীতির, যা খুব ওপেন এন্ডেড, তার সাথে মোটেই মেলে না। তাদের কুকবুক মার্কা শিক্ষার সাথে। যা কিনা কিছু প্রশ্ন আর তার উত্তর — এই নিয়ে। তাতে এইসব গ্রামের পণপ্রথা ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর থাকে। ইউএস এইড আমেরিকান সরকারের সাপোর্টেড প্রোগ্রাম।

জিতেন : এই ধরনের ঘটনা কবে থেকে শুরু হল?

স্টিফেন : আমার মনে হয়, ১৯৯১ আন্দোলনের পর থেকেই।

জিতেন : ১৯৭৮ সালে আমি তখন ছাত্র, দুর্গাপুর আর ই কলেজে। তখন একজন নেপালি ছাত্র এসেছিল আমাদের কাছে, তার কাছে শুনেছিলাম, তখন নেপালে একটা খুব শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন হচ্ছে।

স্টিফেনঃ আসলে নেপালে এরকম বহু আন্দোলন হয়েছে। সেই ইতিহাসগুলো চাপা পড়া ইতিহাস। পৃথিনারায়ণ শাহের সময়ে গোর্খা এলাকায় একটা আন্দোলন হয়েছিল। ...

জিতেন : মাওবাদীরা কীভাবে এই আন্দোলন তৈরি করল?

স্টিফেন : আমার মনে হয় তারা একটা উর্বরা জমিতে চাষ করেছে। কংগ্রেস পার্টি মানুষের অসন্তোষ নিয়ে কাজ করার চেষ্টাও করেনি।

জিতেন : কিন্তু মানুষ এইরকম অস্ত্রধারী আন্দোলনে গেল?

স্টিফেন : আমি সেটা ঠিক বলতে পারব না। আমি মাওবাদী কর্মীদের কাছে যা শুনেছি, তারা মানুষের কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন পেয়েছে। আমার ব্যক্তিগত মত হল তারা একটু সেক্টেরিয়ান। আমি একটা তামাং জনগোষ্ঠীর গ্রামের কথা জানি, সেখানকার একজন লোক আমাকে বলেছিল, সেখানে যদিও চাষি এবং শ্রমজীবী মানুষরা থাকে, সেখানে কংগ্রেস পার্টির খুব জোর। সেখানে মাওবাদীরা সংকীর্ণতার কারণে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি বলে মনে হয়। যদি তারা পার্টির টার্মে না দেখে শ্রেণীর টার্মে দেখত, তাহলে সেখানে তারা প্রভাব বিস্তার করতে পারত। আরও অনেক মানুষকে এই আন্দোলনে আনতে পারত।

জিতেন : এই তামাং গ্রামটা নেপালের কোথায়?

স্টিফেন : এই তামাং গ্রামটা কাঠমাণ্ডুর উত্তরে।

জিতেন : এই অঞ্চলটা লিবারেটেড অঞ্চলের মধ্যে পড়ে না?

স্টিফেন : না। আমি জানি না, এই লিবারেটেড কথাটাকে এখন কীভাবে দেখা উচিত?

শমীক : আমরাও এই লিবারেটেড কথাটাকে তথাকথিত অর্থেই ব্যবহার করছি।

স্টিফেন : হ্যাঁ, তাই করা দরকার।

জিতেন : আমি তাদের বয়ানে কথাটা বলছি। তারা বলেছিল যে সত্তর শতাংশ নেপাল লিবারেটেড, প্রভৃতি...

স্টিফেন : ঠিক আছে। আমার মনে হয় একথাটা বেশ অপটিমিস্টিক একটা কথা। আসল কথাটা হল, সত্তর শতাংশ এলাকা অর্থাৎ গ্রামগুলোতে সরকার বেশ দুর্বল ছিল, তাদের সংগঠনও মজবুত ছিল না। সরকারের খুব একটা নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

জিতেন : এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

স্টিফেন : হ্যাঁ। আর ওই সব জায়গা থেকে সরকার পালিয়ে চলে আসে তাদের জেলা সদরগুলোতে।

শমীক : আমি পশ্চিমবঙ্গের লাগোয়া একটা নেপালি গ্রামে দেখেছিলাম সরকারি দপ্তরগুলো, থানা, কৃষি বিকাশ কেন্দ্র এসব পোড়ো বাড়ির মতো পড়ে আছে। কেউ নেই। শুনেছিলাম নাকি এই থানায় মাওবাদীরা একবার বোম মেরেছিল, তারপর থেকে এই অঞ্চলে থানাকে ঘিরে যে দু-একটা সরকারি দপ্তর ছিল, সেখানকার কর্মীরা সব পালিয়ে গেছে। বিধ্বস্ত থানার গায়ে লেখা ছিল নেপালি কমিউনিস্ট পার্টি মাওবাদীর দেওয়াল লিখন, 'জ্ঞানে চোর, নেপাল ছোড়।'

স্টিফেন : সেই সব জায়গায় ওরা বিকল্প সরকার, তাদের নিজেদের সরকার বসানোর জন্য খুব চেষ্টা করে। কিন্তু আমি জানি না তারা সেগুলোকে কতটা গণতান্ত্রিক করতে পেরেছিল। কারণ ওই অবস্থার সুযোগে এলাকার বেশ কিছু প্রভাবশালী লোক অস্ত্র বাগিয়ে নেয় এবং মাওবাদীদের নামে তারাই শাসন করতে থাকে — এরকম বিচিত্র সব ঘটনাও ঘটেছিল।

জিতেন : কিন্তু কীভাবে তারা শেষ পর্যন্ত ইন্টারভেন করতে পারল সংসদীয় চত্বরে? তাদের শক্তিটা কী ছিল?

স্টিফেন : আমি শুনেছি, এখন মাওবাদীরাই বিভিন্ন গ্রামে সাক্ষরতা কর্মসূচীগুলো নিচ্ছে। আমি আরও খোঁজ নিতে চাই এই বিষয়টা নিয়ে। এটা একটা পজিটিভ ব্যাপার হতে পারে। আমার ভাবনা হল, তাদের নেতৃত্বের কেন্দ্রীয় সরকারের বাইরে থাকা উচিত ছিল। বরং তাদের এইরকম গণতান্ত্রিক কাঠামো তৈরিতে জোর দেওয়া উচিত ছিল, যেখানে মানুষ তাদের নিজেদের মানুষকে নিজেরাই বাছতে পারে। আমার মনে হয় এই কাঠামোগত বিপ্লবটা কোনও একটা রাষ্ট্র দখলের থেকে অনেক বড়ো ব্যাপার। আজকের দুনিয়ায় কোনও রাষ্ট্রই স্বাধীন সত্ত্বা নয়, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। রাষ্ট্রীয় আধিকারিক এবং সচিবরা এই শক্তিশালী বাইরের শক্তির মূল। এবং এর ফলে তারা ডিসক্রেডিটেড হবে। আমার মনে হয় তাদের কাঠামোগত ব্যাপারটাতেই গুরুত্ব দেওয়া দরকার ছিল, যাতে কেন্দ্রীয় সরকারে মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারে। তাতে ক'দিন দেরি হলেও তারাই উপকৃত হত।

শমীক : আমি শুনেছি ওখানে মাওবাদী পার্টির মধ্যে একটা বিতর্ক চলছে, কিরণ লাইন এবং প্রচণ্ড লাইন নিয়ে। আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু জানেন?

স্টিফেন : কিরণ মানে তুমি কি মিলিটারি কম্যান্ডারের কথা বলছ?

শমীক : মনে হয়, হ্যাঁ।

স্টিফেন : হ্যাঁ, আমিও শুনেছি। আমি এর ডিটেলটা জানি না। তাছাড়াও ওখানে প্রচণ্ড এবং বাবুরামের মধ্যেও একটা বিরোধ আছে। কিন্তু বাবুরাম এখন চুপচাপ।

জিতেন : আপনি বাবুরামকে একটা সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনারা 'তলা থেকে চাপ' দেওয়ার জন্য কী পদক্ষেপ নিচ্ছেন? আর এক জায়গায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, মানুষের 'মিন্‌স' বা উপায়টা কী, যার মধ্যে দিয়ে সে কনস্টিটিউন্ট অ্যাসেম্বলিতে চাপ দিতে পারবে?

স্টিফেন : হ্যাঁ, তারা উত্তর দিয়েছিল, যে মানুষ রাস্তায় নামবে। কিন্তু সেসব কিছুই হয়নি। ... এছাড়াও পার্টিতে আর একটা বিতর্ক আছে। অল্পবয়স্ক ক্যাডারদের সঙ্গে পার্টি নেতৃত্বের। আমি কিছু অল্পবয়স্কদের সাথে কথা বলেছিলাম, তখন শুনেছিলাম, এই গোটা প্রক্রিয়াটাতে তাদের মত নেওয়া হয়নি।

... এরপর সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রাম নিয়ে কিছুক্ষণ কথা হয়।

শমীক : আমাদের দেশে ইদানীং যে জনআন্দোলনগুলো হচ্ছে, সেখানে মাওবাদী বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর খুব একটা নেতৃত্ব দিতে পারছে না। নেপালে সেটা পেরেছে।

স্টিফেন : আমার মনে হয় যদি মানুষ আরও কিছুটা সচেতন হত, তাহলে নেপালেও পারত না।

জিতেন : এবং মানুষের এই আন্দোলনগুলো হয়েছে একটা অহিংস পথে। এটা প্রথম শুরু হয়েছিল মণিপুরে ২০০৪ সালে। মনোরমা নামের এক মণিপুরী মহিলাকে ভারতীয় সেনাবাহিনী ধর্ষণ ও হত্যা করেছিল, তার প্রতিবাদে ইম্ফলের ইমা কেইথেল নামের বাজারটা থেকে বারো জন মায়ের বয়সী মহিলা ভারতীয় আর্মির আসাম রাইফেল বিভাগের সদর দফতরের সামনে গিয়ে নিজেদের বসন খুলে ফেলে বলেছিল, 'এসো আমাদের ধর্ষণ করো। আমাদের হত্যা করো'। ওটা ছিল একটা মোড় ঘোরানো ঘটনা। তার পরেই গোটা মণিপুর প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য কার্ফু জারি করতে বাধ্য হয়। এটা ছিল একটা সরাসরি লড়াই। ডাইরেক্ট অ্যাকশন। কিন্তু এটা ছিল অহিংস।

স্টিফেন : কিন্তু নেপালে এইরকমই একটা উলটো ঘটনা ঘটেছিল। একবার গৃহযুদ্ধ শেষ হবার বছর দু'য়েক আগে এক জায়গায় এক মাওবাদী মহিলা স্কোয়াড মিলিটারির হাতে পড়ে। মিলিটারি তাদের আত্মসমর্পনের জন্য দশ মিনিট সময় দেয়। মাওবাদীরা ভেবেছিল, এই দশ মিনিটের মধ্যে হয়তো পিছন থেকে কোনও মাওবাদী স্কোয়াড এসে পড়বে। কিন্তু তা হয়নি। বদলে এসেছিল আরেকটি মিলিটারি স্কোয়াড, ফলে তারা দুদিক থেকেই ঘেরাটোপে পড়ে যায়। তখন মহিলা নেত্রী তাঁর জামা খুলে ফেলেন, তারা ভেবেছিল আর্মি হয়তো তাহলে তাঁকে ধরতে পারবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারি তাঁর বুকে গুলি করে দেয়। এটা মাওবাদীদের পক্ষে একটা বড়ো ধাক্কা ছিল। কেবল অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের জন্য এটা হয়েছিল। এবং এটা নেপালের গৃহযুদ্ধে একটা মোড় ঘোরানো দিক ছিল। আজকে এই পৃথিবীর যুদ্ধবিগ্রহে মেয়েদের একটা দুর্বল জায়গা বলে ধরা হয় এবং তাদের কব্জা করার চেষ্টা থাকে। আমি জানি না, এটা আমার মনে হয়।

জিতেন : মণিপুরের আন্দোলনটা অনেকদিন পরে একটা বড়ো আন্দোলন ছিল। প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত ওদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে বাধ্য হন। ...

স্টিফেন : অনেক সময় আন্দোলনকে তার প্রেক্ষিত থেকে আলাদা করে দেখানোর চেষ্টা হয়। যেমন আমাদের আমেরিকাতে কালোদের আন্দোলনে রোজা পার্কের কথা আসে। এমন ভাবে দেখানো হয় যেন বা রোজা পার্ক একদিন বাসে বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদ করেছিলেন আর আমেরিকায়

বর্ণবিদ্বেষবিরোধী গণ-আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। কিন্তু বাস্তবে রোজা পার্ক একটা সংগঠনের সদস্য ছিলেন। তারা অনেকদিন থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছিল এই ধরনের ঘটনার জন্য। কিন্তু এটা চেপে যাওয়া হয়।

জিতেন : একটা বিখ্যাত মণিপুরী নাটক, যেটা এই ঘটনার চেয়ে পুরনো, সেটার নাম দ্রৌপদী, সেটাতেও দেখানো হয়েছিল এরকম একটা ঘটনা। দ্রৌপদী একজন সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী জঙ্গি। তো সে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মিলিটারি তাকে জঙ্গলে ঘিরে ফেলেছে। ধরা পরার প্রাকমুহূর্তে সে তার বসন খুলে ফেলছে। সেটাই শেষ দৃশ্য। ... নন্দীগ্রামে মানুষের ঐতিহ্য আছে, ওইভাবে রাস্তা কাটার। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ১৯৪২-এ নন্দীগ্রামের কাছেই স্বাধীন তাম্রলিপ্ত সরকার তৈরি হয়েছিল মহিষাদলে। তখনও নন্দীগ্রামে এইরকম ভাবেই রাস্তা কেটে ফেলা হয়েছিল ইংরেজকে আটকানোর জন্য।

স্টিফেন : নেপালেও কাঠমাণ্ডু উপত্যকার আশেপাশে নিজেদের সরকার তৈরি করেছিল। এফএম রেডিও ছিল তাদের। শোনা যেত, 'রেডিও ফ্রি নেপাল'।

জিতেন : সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধী ছিলেন নেতৃত্বে। তিনিই স্লোগানগুলো তৈরি করেছিলেন। লবণ সত্যাগ্রহ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন। কমিউনিস্টরা সেই সময় স্লোগানগুলো তৈরি করতে ব্যর্থ হয়।

স্টিফেন : আমি বামপন্থীদের বয়ানে শুনেছি, গান্ধী পরে প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছিলেন ...

জিতেন : আপনি কি গান্ধীর খাদি আন্দোলন সম্পর্কে পড়েছেন?

স্টিফেন : হ্যাঁ কিছুটা জানি।

জিতেন : আপনি কী মনে করেন, নেপালে মাওবাদীরা কি জনআন্দোলনের মনোভাবের সঙ্গে নিজেদের মেলাতে পারছে?

স্টিফেন : আমি ঠিক জানি না। আমি পরে আপনাদের এই বিষয়ে বলার চেষ্টা করব। আমি চাইব যে তারা শিল্পায়নের মাধ্যমের উন্নয়নের রাস্তায় না যাক। চাষের ওপর তাদের নির্ভর করা ভালো, তাহলে তারা — আমি যেটাকে বলছি কমার্শিয়ালাইজেশন — সেটা এড়াতে পারবে। আমি জানি না, তাদের কোনও ভালো বিকল্পের কথা মাথায় আছে কিনা।

জিতেন : আপনি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ... নেপালে আপনার কী মনে হয়, প্রক্রিয়াগুলো কী, যেগুলোর ভবিষ্যতে সম্ভাবনা আছে, আজকের দিনে তা ছোটো হলেও?

স্টিফেন : আমি নির্দিষ্ট করে বলতে পারব না। নেপালের গ্রামগুলিতে প্রচণ্ড ক্ষমতা আছে। প্রচুর সম্ভাবনা আছে। আমি সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু সেখানে অনেক ধরনের জিনিস আছে। কমিউনিটি রেডিও শুরু হয়েছিল। আমি এ সম্পর্কে আপনাদের পরে জানাতে পারি।

জিতেন : আমরা চাইছি নেপালে গিয়ে সরাসরি দেখতে যে কী হচ্ছে, কারণ আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি না। আর আমাদের এখানে নেপালের আন্দোলন অনেক আশা জাগিয়েছিল।

স্টিফেন : হ্যাঁ। আমেরিকাতেও।

জিতেন : অবশ্য যারা বলছে যে নেপালে খুব ভালো একটা জিনিস হচ্ছে, তারা গোল গোল করে কথাটা বলতে পারছে। কংক্রিট ভাবে কিছু বলতে পারা যাচ্ছে না।

স্টিফেন : আমি শুনেছি, মাওবাদীরা নেপালে গণ-সাক্ষরতা কর্মসূচী নিয়েছে। আমার মনে হয় এটা সত্যিকারের একটা সম্ভাবনাময় পদক্ষেপ।

শমীক : কী ধরনের গণ-সাক্ষরতা কর্মসূচী?

স্টিফেন : সেটাই আমারও প্রশ্ন।

জিতেন : কোনও বই-পত্র আছে কি?

স্টিফেন : মানে?

জিতেন : মানে তারা যা করতে চাইছে তা সম্পর্কে তারা যে লোককে জানাবে, তা কীভাবে?

স্টিফেন : নেপালে প্রচুর কাগজ আছে। আমেরিকার মতো নয়, যে কয়েকটা মাত্র কাগজের মনোপলি। তাছাড়া নেপালে কয়েকটা কমিউনিটি রেডিও আছে। সেখানেও অবশ্য দুই ধরনের উদ্যোগ আছে। একটা উদ্যোগ এনজিও-রা চালায়। আর একটা চালায় কমিউনিটি। ধরুন একটা গ্রামে তিনশ মানুষ আছে। তারাই ২৪ ঘন্টার একটা ডিজিটাল রেডিও স্টেশন চালায়। আমাদের আমেরিকাতেও এরকম বেশ কিছু আছে ... র‍্যাডিকালরা সেখানে এই মাধ্যমটাকে চিরকাল ব্যবহার করে এসেছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় এটা প্রতিবাদের একটা বড়ো মাধ্যম ছিল।

জিতেন : আর সেখানে প্রিন্ট মিডিয়ায়?

স্টিফেন : ছিল অনেকগুলো। কিন্তু সেগুলো খুব প্রান্তিক। টিভির প্রভাব খুব বেশি।

শমীক : কিন্তু কমিউনিটি রেডিও কীভাবে সারভাইভ করে?

স্টিফেন : আমরা প্রতি তিন-চারমাস অন্তর ফান্ড তুলি কমিউনিটির মধ্যে থেকে। বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাঝে মাঝে এটা কেন দরকার তা ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু এখন সেটা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানকার লোকেদের পক্ষে। আমেরিকার অর্থনীতির বেহাল দশার জন্য।

শমীক : উইকিপিডিয়াও সমস্যায় পড়েছে এজন্য, মানুষ অতটা অনুদান দিতে পারছে না।

স্টিফেন : হ্যাঁ। তবে মনে হয় ওরা তুলে ফেলেছে। কিন্তু লোকের কাছে অনেকটা বলতে হয়েছে।

জিতেন : আপনি কি এই সাক্ষাৎকারের পর আর কিছু লিখেছেন?

স্টিফেন : আমি আসলে এখন মজে আছি জৈবিক চাষ, প্রাকৃতিক গৃহনির্মাণ, মাটির পাত্র (থালাবাসন) তৈরি এবং গ্রামজীবন নিয়ে। নেপাল এবং আমেরিকা — দুই জায়গাতেই। আমেরিকাতে একটা প্রাকৃতিক গৃহনির্মাণ আন্দোলন আছে। মাটি, খড় দিয়ে বাড়ি তৈরি করা হয়। সেগুলো সত্যিই খুব সুন্দর। সিমেন্টের চেয়ে অনেক সুন্দর। এটাতে অবশ্য শ্রম একটু বেশি লাগে। আমেরিকায় যাদের বেশি পয়সা নেই, তারা এগুলো বানিয়ে নেয়।

শমীক : ভারতে মানুষ নিজেরাই এগুলো তৈরি করে।

স্টিফেন : হ্যাঁ। এই টেকনিকটা হাজার হাজার বছরের পুরনো।

জিতেন : নেপালেও তো এই ধরনের ঘর আছে?

স্টিফেন : হ্যাঁ। আমি চাইছি ওখানে এরকম একটা বাড়ি বানাতে। আর আছে রকেট স্টোভ। এই স্টোভে জ্বালানিটা পুরোটা পোড়ে। সাধারণত কাঠ ব্যবহার করা হয়। মাটি আর খড় দিয়ে গা-টা বানানো হয় যাতে তাপটা বাইরে বেরিয়ে না যায়। হাওয়া দেওয়ার জায়গা আছে। এশিয়া, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকায় এই ধরনের উনুনের বহুল ব্যবহার আছে।

নৈহাটির গৌরিপুর জুট মিল

বঞ্চনা ও ঘুরে দাঁড়ানোর কাহিনী

শীর্ষেন্দু দত্ত

গরিফার গৌরিপুর জুট মিল আজ বন্ধ। ১৯৯৭ সাল থেকে বন্ধ। এ রাজ্যে কারখানা বন্ধ কোনও নতুন ঘটনা নয়। উত্তর চব্বিশ পরগণার ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল, হুগলী জেলার শিল্পাঞ্চল — সর্বত্র শ্মশানের ছবি। ভাঙ্গা দেওয়াল, জং-ধরা তোবড়ানো গেট, জলা-জঙ্গলে ভর্তি কারখানার ধ্বংসাবশেষ — এ এক পরিচিত দৃশ্য। তবু চারদিকে জমি নেই, জমি সেই হাহাকার। এসব অংক বড়ো জটিল। বুঝতে পারা সোজা নয়। বুঝলে তো আপনিও রতন টাটা কিংবা কোনও বড়ো বামপন্থী নেতা হয়ে যেতেন। এই বোঝাবুঝির অংকে না গিয়ে আসুন, সামনের ছবিগুলিই কেবল দেখি। ভাবনা চিন্তা নিজের মতো করে হবে। এক সময় নৈহাটির পরিচয় ছিল গৌরিপুরের নামে। ১৮৮৫ সালে এই কারখানা গড়ে উঠেছিল নৈহাটির গরিফায়, প্রায় ৮০০ একর জমির উপর। পূর্বে আর বি সি রোড, পশ্চিমে গঙ্গা, দক্ষিণে শিবালয় চৌমাথা। এর মধ্যে গৌরিপুর চৌমাথা থেকে শুরু করে উত্তরে গরিফা স্টেশন, হুগলী ব্রীজ। এই গোটা চত্বরেই ১৮৮৫ সালে কারখানা চালু হয়। ম্যাকনীল বেরি এই মিল পত্তন করে। এই সময়েই গঙ্গার ওপর সেতুটি তৈরি হয়। দুটিই একই কোম্পানি করে। ম্যাকনীল বেরির আসলে ছিল চাবাগান। নাম গৌরিপুর টি এস্টেট। তার থেকেই এই কারখানার নাম হয় গৌরিপুর জুট মিল। জুট মিল ছাড়াও এই গৌরিপুরের জমি লিজ নিয়ে গড়ে উঠেছিল কন্টেনার্স ক্লোজার্স, গৌরিপুর থার্মাল পাওয়ার স্টেশন, জেনসন নিকলসন। এমনকি গরিফা স্টেশনটির জমিও এদের থেকে লিজ নেওয়া জমিতে। রেললাইন ঢুকে গেছিল মিলের মধ্যে। তাতে ওয়াগান ভর্তি জুট সরাসরি বেরোত ঢুকত। স্বাধীনতার আগে এখানে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২২,০০০। এদের জন্য স্থায়ী আবাসন, কুলি লাইন, অফিসার্স কোয়ার্টার্স, বিশাল গৌরিপুর বাজার, মীরাবাগান ময়দান, নিজস্ব জল — পরিষেবা 'পানি ট্যাংকি', নিজস্ব ছাপাখানা, রেশন শপ, মোটর রিপেয়ারের গ্যারেজ, এমনকি মিলে কর্মরত প্রচুর মহিলা শ্রমিকদের বাচ্চাদের রাখার জন্য ক্রেশ পর্যন্ত ছিল এখানে। ১৯৬০ সালের আগে এসব দেখা যেত। পাশাপাশি মসজিদ — মন্দির এখনও আছে। হিন্দু এবং মুসলিম শ্রমিকরা এখানে বছরের পর বছর পাশাপাশি থেকে গেছে। আজ অবধি কোনও সমস্যা হয়নি। ১৯৪৬-এর দাঙ্গা, কিংবা বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময়েও এখানে দুই সম্প্রদায় নিশ্চিন্তে রাত কাটিয়েছে পাশাপাশি। ১৯২০-২২ সালে এখানে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ শুরু হয় সন্তোষ কুমারী গুপ্তার নেতৃত্বে। অনেক বলে ইনিই দেশের প্রথম মহিলা ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী। ইনি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অনুগতা শিষ্যা। ১৯২০-২২ সালে সন্তোষ কুমারী গুপ্তা প্রতিষ্ঠা করেন গৌরিপুর ওয়ার্কমেন্স অ্যাসোসিয়েশন। ১৯২৪ সালে সন্তোষ কুমারীর নেতৃত্বে শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে স্ট্রাইক হয়। এরপর এই চটকল শ্রমিকদের আন্দোলন ব্যাপ্তি পেয়ে অন্য মিলেও ছড়িয়ে যায়। গৌরিপুর জুট মিল এবং সন্তোষ কুমারী গুপ্তা রাজ্যের চটকল শ্রমিক আন্দোলনের জনক কিংবা দিশারী। ১৯২৮-এর পর শ্রীমতী গুপ্তা সক্রিয় রাজনীতি থেকে ধীরে ধীরে সরে আসতে শুরু করেন। তিনি শবরদের উন্নয়ন ও আরও বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন। যে কথা বলছিলাম, পুজো-ঈদ-দেওয়ালী, মেলা-উৎসব ইত্যাদির আলো ঝলমল, এক কালের প্রাণময় এই গৌরিপুর শিল্পাঞ্চল আজ শ্মশানে পরিণত হয়েছে। আটশ একরের এই জনপদ-শিল্পাঞ্চল আজ জলা-জঙ্গল, ভাঙ্গা ইমারত, সাপ-বেজি, চুল্লু-গাঁজা, খুন-ধর্ষণের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এখান দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে মনে আসে সিন্ধু সভ্যতার কথা। এক মৃত নগরীর উপাখ্যান। মানুষের লোভেই হারিয়ে গেছিল সেই সভ্যতা। যে সভ্যতা মানুষের দ্বারাই সৃষ্ট। কিংবা মিলের কোনও ভাঙ্গা ইমারতের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে যখন দেয়ালে গজানো বটবৃক্ষের ডালে কোনও সরীসৃপ দর্শন হয়, তখন মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণ' এর কথা! জলা-জঙ্গল ভেদ করে কে যেন বলে ওঠে, 'সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়'। হ্যাঁ। ঝুট সর্বময়। কোনটা ঝুট নয় বলুন? আজকের প্রজন্মের কোনও তরুণকে যদি গরিফার সেই স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলির কথা কোনও প্রধান বলে, তাহলে সে তো বলবেই – 'সব ঝুট হ্যায়। কিংবা সন্তোষ কুমারী গুপ্তা যে শ্রমিক আন্দোলনের জন্ম দিয়ে গেছিলেন, তাঁর উত্তরসূরীরা আজ যা করে বেড়াচ্ছে, তা দেখে কোনও বৃদ্ধ শ্রমিক বলে উঠতেই পারেন — 'সব ঝুট হ্যায়'। এই সমৃদ্ধ জনপদটিকে মহেঞ্জোদারোর মতো মৃত নগরীতে রূপান্তর করার যে ধারাবাহিক ক্যারিশমা — তা দেখানোর সূত্রপাত করেছে মালিকশ্রেণী, আর তা দেখানোর শেষ দৃশ্য রচিত করছে বড়ো বড়ো বাম নেতারা। অদ্ভুত ব্যাপার, কেবল জুট মিলই নয়। নৈহাটির সমস্ত মিলই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অথবা বন্ধের পথে এগিয়ে চলেছে। গৌরিপুরের চারটি কারখানা। সবকটি বন্ধ। কারণ? অজানা, অবাস্তব এবং মিথ্যা। সে ছবিগুলোও দেখা দরকার। কারণ সব কিছুই সম্পর্কিত।

জেনসন অ্যান্ড নিকলসন

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রং কারখানা। ভাল বেতন, সাবসিডি দেওয়া ক্যান্টিনে নামমাত্র মূল্যের খাবার, আবাসনের সুব্যবস্থা — সব নিয়ে বেশ জমজমাটভাবে চলত এটি। ১৮ ডিসেম্বর ২০০৪ সাল। মেইনটেন্যান্সের জন্য তিনমাস বন্ধ থাকবে ঘোষণা করে কারখানাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। আজ, চার বছর অতিক্রান্ত। মেইনটেন্যান্সের কিছু হয় নি। কারখানাও খোলার নাম গন্ধ নেই। কেন? শ্রমিক-কর্মচারীরা জানে না। বন্ধের সময় কোনও শ্রমিক অসন্তোষ, ঘেরাও কিছুই হয়নি। ইউনিয়নের নেতারা কী বলছেন, এখানে সিটুর ইউনিয়ন ছাড়া আর কেউ নেই। তাদের নেতা অমল গুহ। যিনি আবার সিপিআইএম নৈহাটি লোকাল কমিটিরও সম্পাদক। তবে মজার ব্যাপার, এখানে কোনও ইউনিয়নের অফিসেই নেই। অমল গুহ চার বছর ধরে রোজই বলছেন, 'দু-এক দিনের মধ্যেই খুলবে'। বন্ধ কারখানার শ্রমিক সংখ্যা ২৬০ জন। সর্বনিম্ন মজুরি ৫০০০ টাকা। এই কোম্পানির অন্য সবকটি কারখানাই চালু। এখনও মিলের আবাসনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শ'দেড়েক মানুষ বাস করে। এরা কেউ এখন দুরের কোনও কারখানায় দৈনিক মজুরিতে কাজ করে, কেউ হকার, কেউ নির্মাণ শ্রমিক। আবাসনে আলো থাকে রাত ১১টা থেকে ২টো অবধি। দিনে তিন ঘন্টা। জল সকালে ২৫ মিনিট, বিকেলে ১০ মিনিট।

কন্টেনার্স অ্যান্ড ক্লোজার্স কোম্পানি

১৯৮৫ সালে এটি শেষবারের মতো বন্ধ হয়ে গেছে। এটিতে হত নানা ধরনের কৌটো, ক্যান ও মুখের ঢাকনি। প্রথমে ৪০০-৪৫০ জন শ্রমিক ছিল। বন্ধের সময় ৩০০ জন ছিল। পিএফ-এর টাকা বেশিটাই গায়েব। প্রথমবার বন্ধ হয় ১৯৮৩-তে। তারপর টিকমানির মালিকানায় ১৯৮৫-তে কিছু দিন খুলে চূড়ান্তভাবে বন্ধ হয়ে যায়। তখন এর নাম 'কন্টেনার্স অ্যান্ড ক্যাপ্‌স কোম্পানি। এই টিকমানির একজন মালিক ছিলেন নৈহাটির প্রাক্তন বিধায়ক তথা সিপিআইএম নেতা গোপাল বসু। বর্তমানে প্রয়াত।

এখানে প্রধান ইউনিয়ন ছিল সিটুর। শ্রমিকরা এদের ভূমিকা নিয়ে ক্ষুব্ধ। কারণ, কারখানা খোলা বা বকেয়া টাকার জন্য এদের কোনও চেষ্টা ছিল না। এখনও কোনও আন্দোলন করে না সিটু বা পার্টি।

গৌরিপুর থার্মাল পাওয়ার

এটি তৈরি হয়েছিল নৈহাটি শিল্পাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য। কারখানাইগুলিতে বিদ্যুৎ দিয়েও সে আশপাশে সরবরাহ করত। লোডশেডিং নৈহাটিতে হত না। ১৯৮০ সালেও এখানে ২৫০–৩০০ জন কর্মচারী ছিল। প্রকল্প আধুনিকীকরণের জন্য কাজ বন্ধ হয়। আজ অবধি খোলেনি। বন্ধের সময়েও এখানে ৪–৮ মেগাওয়াট বিদ্যুত উৎপাদন হয়েছে। এই কেন্দ্র খোলার ব্যাপারে কোনও সরকারি সদিচ্ছা না থাকলেও নতুন বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য সরকার নাকি কোথাও জমি পায় না। যেখানে যায় সেখানেই বিরোধীদের উস্কানিতে জমি মালিকরা বেঁকে বসে। কিন্তু গৌরিপুরের মানুষ সরকারকে দু'হাত তুলে আশির্বাদ করত, যদি তারা এটি খুলত।

আইপিপি বা কাগজ কল

দীর্ঘদিন বন্ধ। এটি যখন বন্ধ হয়, তখন এটি ছিল সরকার চালিত। ১৭–১৮ হাজার শ্রমিক কাজ করত। তাদের জোর করে বাধ্য করা হয় স্বেচ্ছাবসর নিতে। সিটু ইউনিয়ন তাকে মদত দেয়। তারপর শ্রমিক শূন্য এই মূল্যবান যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ কারখানাটিকে জলের দরে বেচে দেওয়া হয় বালাজী গ্রুপের কাছে। সম্প্রতি উৎপাদন আবার শুরু হয়েছে। সামান্য কিছু শ্রমিককে কাজ দিয়েছে। আগের বেতনের থেকে অর্ধেক বেতনে শ্রমিকরা এখন কাজ করছে। সিটু পার্টি সরকার চুপ! কেন? উত্তরে কবীর সুমনের সেই গানটা ভেবে নিন — 'এসব প্রশ্ন কোরো না। বোবা কালা হয়ে থাকো।'

নদীয়া জুট মিল

নৈহাটির দক্ষিণ দিকের এই মিলটিকে গৌরিপুর জুট মিলের 'সিস্টার মিল' বলা হত। পরস্পরের বিভিন্ন সাদৃশ্য থেকে এই কথা চালু ছিল। ১৯৮৫–৮৬ সাল থেকেই একসময়ের জমজমাট এই মিল কখনও লকআউট, কখনও সাসপেনশন অব ওয়ার্ক, কখনও মেইনটেনান্স, কখনও আগুন লেগে যাওয়া ইত্যাদি নানা ছলছুতোয় কখনও বন্ধ, কখনও খোলা চলছে। ২০০৬ সাল থেকে পবন শিকারিয়া নামে একজন মিল চালাচ্ছেন। সে সময় থেকে মিলের বাঁশি বাজানো বন্ধ। অথচ উৎপাদন হচ্ছে, মাল বাইরেও যাচ্ছে। মালিকের কোটি কোটি টাকা আয় হচ্ছে। আইনত বন্ধ থাকায় (বাঁশি বাজে না,তাই) সরকারকে কর বাবদ এক পয়সাও দিতে হয় না। রাজনীতির রাঘব-বোয়ালদের ছত্রছায়ায় এভাবেই দিনেদুপুরে পুকুর চুরি চলছে। এতো গেল সরকারি কর চুরির ছবি। এবার আসুন, দেখা যাক শ্রমিক শোষণের ছবি।

১৯৯২ সাল। মিলে শ্রমিক-কর্মচারী ৫০৯৩ জন। দৈনিক উৎপাদন ৬০ টন। বকেয়া পিএফ আট কোটি টাকা। আর আজ, ২০০৮ সাল। শ্রমিক-কর্মচারী ২৬০০ জন। যন্ত্রও আর্ধেক। কিন্তু উৎপাদন ৫০ টন। বকেয়া পিএফ ২০ কোটি টাকার বেশি। অর্থাৎ শ্রমিক সংখ্যা ৫০৯৩ থেকে কমে ২৬০০ জন। প্রায় অর্ধেক। যন্ত্রও অর্ধেক। কিন্তু উৎপাদন? আগে ৬০ টন ছিল, এখন ৫০ টন। অর্থাৎ শ্রমিক অর্ধেক হয়েত উৎপাদন কমেছে মাত্র ১০ টন। মানে খাটনি ডবল হয়েছে। আর বকেয়া পিএফ? সেও লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে ৮ কোটি থেকে ২০ কোটি টাকা। ইউনিয়ন? তারা রাজ্যের শিল্পায়নের স্বার্থে এখন মালিকের পরামর্শদাতা! তাদের পরামর্শে চলছে আরেক খেলা। শুনুন।

আটান্ন বছর পার হলে শ্রমিকদের বলা হচ্ছে অবসরকালীন পিএফ, গ্রাচুইটি কিছু দেওয়া যাবে না। পোষালে অবসর না নিয়ে কাজ চালাও। মজুরি অর্ধেক। ১২০ টাকা রোজ। পিএফ বা অন্য সুযোগসুবিধা পাওয়া যাবে না। মানে একজন দক্ষ শ্রমিককে হাফ মজুরিতে, ডেলি লেবার হিসাবে খাটিয়ে মালিকের পেট ফোলাও। আবার শ্রমিকদের মজুরি থেকে দৈনিক ত্রিশ টাকা করে কাটা হচ্ছে মিলকে বাঁচানোর জন্য! কোনও কথা বলা যাবে না। কোনও আন্দোলন করা যাবে না। করলেই কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে — হুমকি। হুমকি দিচ্ছে মালিক এবং নেতা উভয়ে। ব্ল্যাকমেল করে মধ্যযুগীয় শোষণ ও নিপীড়ন চালাও শ্রমিকদের ওপর। BCMU (সিটুর) চালিত ট্রাস্টি। ১৫ বছর ভোট হয় না। কোনও হিসেব দেবার বালাই নেই। হিসাব চাইলে নেতারা ক্রুদ্ধ হন। মালিক সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছে ট্রাস্টি হিসাব দিক, সাত দিনের মধ্যে তার বকেয়া সে দিয়ে দেবে। উত্তর নেই। বর্তমানে ১৬০০ শ্রমিক অবসর নিয়েছে। টাকা পায়নি। চরম দুর্দশাগ্রস্ত। গত ২৫ অক্টোবর ২০০৮-এ আবার মিল বন্ধ। আগের দিনও কেউ কোন আভাস পায়নি। কোন ঘটনাও ঘটেনি। ওদিন ছিল মাইনা দেবার দিন। তিন দিন পর দেওয়ালি। পরিবারগুলো সকাল থেকেই মুখিয়ে ছিল, মাইনা পেলে কেনাকাটা করবে। সব বদলে গেল মুহূর্তে। ক্ষেপে উঠল শ্রমিকরা এবং তাদের পরিবারের অন্যরা। নৈহাটি স্টেশনে লাইনে অবরোধ করে বিক্ষোভ জানাতে গেল তারা। হাজির হল পুলিশ। পিটিয়ে অবরোধ তুলে দিল তারা। মার খেয়ে শ্রমিকেরা ফিরে গেল মিলের গেটে। তারা বুঝে উঠতে পারল না, কী তাদের দোষ। বর্তমান জেনারেল ম্যানেজার এন জি কুণ্ডু। তাঁর বক্তব্য, শ্রমিকেরা আন্দোলনের নামে মিলে বিশৃঙ্খলা করছিল। তাই মিল বন্ধ করতে বাধ্য হল কর্তৃপক্ষ। যারা হাফ মজুরিতে কাজ করে, যারা রোজ থেকে ত্রিশ টাকা কম নেয়, যারা লাখ লাখ টাকার পিএফ খোয়ায় — তারা নাকি বিশৃঙ্খল! আসলে এন জি কুণ্ডুর ট্র্যাক রেকর্ড ঘাঁটলে দেখবেন, যেখানেই তিনি যান, সেখানেই এরকমটা ঘটে। লোকে আড়ালে বলে, এগুলি করার জন্যই নাকি মালিক তাঁকে কনট্রাক্টে নিয়ে আসে! ইউনিয়নগুলির ভূমিকা আলাদা করে কী বলার আছে! কিছুদিন আগে সিঙ্গুরে টাটা কারখানা বিতর্কে শাসক দলের এক নেতা বললেন, "চাষার ছেলে চিরকাল চাষাই থাকবে নাকি?" শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সেই একই শ্লোগান তারা অঘোষিতভাবে দিয়ে দিয়েছে। সেটা হল শ্রমিকনেতাকে মনন এবং প্রয়োগে শ্রমিকই হতে হবে নাকি! তাই বোধ হয় প্রয়াত বিধায়ক CC কোম্পানির অংশীদার হন। এখানকার সাংসদ তথা সিটুর নেতাকে শ্রমিকদের এই চরম দুর্দিনে ময়দানে দেখা যায় না। তিনি নদীয়া জুট মিলের পুলিশের হাতে প্রহৃত শ্রমিকদের (যারা সিটুর সমর্থক) পাশে না থেকে এয়ারপোর্ট সংলগ্ন সিটু অফিসে এয়ার হোস্টেসদের নিয়ে মিটিং করছেন। তাদের সংগঠিত করে লাল পতাকাতলে আনাটাই তখন বেশি জরুরি। কারণ এসব বিমানকর্মীদের তখন তাদের সংস্থা বসিয়ে দিয়েছে। পরে অবশ্য আবার নিয়ে নেয়। একদিকে সদ্য বন্ধ হওয়া নদীয়া মিলের সর্বহারা শ্রমিক, অপরদিকে উচুঁ বেতন পাওয়া বিমান পরিষেবিকারা, তাদেরও কাজ বন্ধ। কমিউনিস্ট সাংসদ সত্যিই শ্রেণী সচেতন।

রাজনৈতিক দলগুলির কর্মীরা ট্রেড ইউনিয়ন করবেন, এটাই ঘটনা। তিনি সেই পেশার সাথে যুক্ত নাও হতে পারেন। কিন্তু মানসিকতা যদি হয় ভোগবাদে, তাহলে তিনি কী করে ভিন্ন পেশার মানুষদের গণসংগঠনে কাজ করবেন? আগের কথিত সেই সাংসদটির ছাত্র-যৌবনকাল, বেড়ে ওঠা ছিল এক উদ্বাস্তু কলোনিতে। আজকে তিনি সল্টলেক নিবাসী। এটা স্বাভাবিক, হতেই পারে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা পিএফ খোয়ানো কোন শ্রমিক যদি তাঁকে প্রশ্ন করে যে — আপনার ছেলে কী করে পেট্রল পাম্পের মালিক হয় — তাহলে কি সেসব প্রশ্ন করা অযৌক্তিক হবে? কিংবা প্রশ্নকারী শ্রমিকটি কি প্রতিক্রিয়াশীল? না মিডিয়ার প্রচারে বিভ্রান্ত?

গৌরিপুর জুট মিল নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে গোটা নৈহাটি শিল্পাঞ্চল নিয়ে কথা বললাম কেন, পাঠক আশা করি বুঝবেন। প্রতিটা কারখানার ঘটনার সাথে গৌরিপুরের মিল আছে। তাছাড়া একটা নির্দিষ্ট

এলাকা জুড়ে কেন এই বন্ধের মিছিল! আসলে এ এক পরিকল্পিত উদ্যোগ। গঙ্গায় ধার ধরে শয়ে শয়ে একর শিল্প জমি খালি করার এক চক্রান্ত! গন্ধটা খুবই চেনা। হ্যাঁ, সেই রিয়েল এস্টেটের গন্ধ।

মি. রায় (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) একজন এমবিএ। তাঁর বাবা এই মিলের উচ্চপদে কাজ করতেন। তিনি নিজে বিভিন্ন জুট মিলের ম্যানজমেন্টে ছিলেন। সর্বশেষ বছর দশেক আগে মেঘনা জুট মিলের লেবার অফিসার ছিলেন। এখন জুট ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে দিয়েছেন ঘেন্নায়। তিনি বললেন, 'জুট মিল কেনা হয় এক টাকায়। এসব পিছন থেকে হয়। হিসেবে দেখা যায় জুট মিলে লস খাবার কোন জায়গা নেই। নেতারা জটিলতা বাড়িয়ে মিল বন্ধ করে, জমি খালি করে, তাতে প্রমোটিং করতে চায়'।

গোটা ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের জুট ইন্ডাস্ট্রিতে কান পাতলে আরেকটা কথাও শোনা যায়। সেটা হল, এসব মিল কেনা, লিজ নেওয়া — আড়াল থেকে আসলে করেন একজনেই। আমরা সামনে যাদের দেখি তারা পুতুল মাত্র। সেই 'একজন'ই নাকি বেনামে বারবার লিজ হস্তান্তর করে মিল তুলে দেয়। তারপর এই জমি যদি একবার খালি হয়ে যায়, তবে আর দেখে কে। ৪-৫ লাখ টাকা কাটা। শয়ে শয়ে একর জমি! কয়েক কোটি টাকা এদিক ওদিক ছড়িয়ে দিলেও ক্ষতি কী! বিটি রোডের কিছু জুট মিলও সেই 'একজন' বেনামে চালায়। কে এই 'একজন'? সরকারি হাসপাতালে বাতিল, এক্সপায়ার্ড ব্লাড কিট সাপ্লাইয়ের কেলেংকারি ঘটিয়েছিল এই ব্যবসায়ীটি। এক টিভি চ্যানেলেও লগ্নি করেছে। সেখানেও শাসক দল এবং আরও অনেককে খুশি করার জন্য একটি তদন্তমূলক অনুষ্ঠানের সাংবাদিকদের বিতাড়ন করেছেন তিনি। নেতাদের ছত্রছায়ায় তিনি বেড়ে চলেছেন, ফুলে চলেছেন, ফেঁপে উঠেছেন।

তবে এই নেপথ্য কাহিনী এখনও প্রমাণিত হয়। লোকের মুখেই গুজবের স্তরে। তবে, যা রটে, তার কিছু তো বটেই!

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা একের পর কারখানা অধ্যুষিত এই শিল্পাঞ্চলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অবক্ষয়। দক্ষ শ্রমিকের দল আর কিছু না পেয়ে কেউ টানছেন রিক্সাভ্যান, কেউ হকার, কেউ নির্মাণ শিল্পে জোগাড়ের কাজ পাবার আশায় ভিড় জমাচ্ছেন বিভিন্ন রেল স্টেশনের শ্রমিক বাজারে। পরিণত হচ্ছে অসংগঠিত শ্রমিকে। তাই দিন দিন অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক বেড়ে চলেছে। সিটুর সব থেকে বেশি সদস্য হয় পশ্চিমবঙ্গ নির্মাণ কর্মী ইউনিয়নে। এই সব রাজ্যে ৮০-৮৫ লক্ষ শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে। সংখ্যাটা বেড়ে চলেছে। ফলে, এই সব পেশায় মজুরি কমে যাচ্ছে। নিজেদের মধ্যে বিবাদ বাড়ছে। আগে নৈহাটিতে যা রিক্সা চলত, তা প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। চড়ার লোক কমে যাচ্ছে। একজন পুরনো হকারের বিক্রিতে ভাগ বসাচ্ছে নতুন আসা হকারের দল। রাজনৈতিক দলগুলোর শ্রমিক সংগঠনের তাতে পোয়াবারো! অসংগঠিত শ্রমিকদের সদস্য সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বেড়ে চলেছে ইউনিয়ন ফান্ড। বাড়ছে মিছিলে ভীড় করার লোক! রিক্সা চালানো, বেআইনি হকারি ইত্যাদির জন্য কিছু সুবিধা পাইয়ে এই মানুষদের দিয়ে মিটিং মিছিলে ভিড় বাড়াও। প্রয়োজনে মাস্তান তৈরি করো। প্রমোটারি-ভোট-শ্রমিক নিধন, কত কাজে লাগে এসব। নৈহাটির পাশেই হাজিনগরে হুকুমচাঁদ জুট মিলে এই গৌরিপুর আর অন্য বন্ধ মিলের শ্রমিকরা গিয়ে ৫০-৬০-৭০ টাকা রোজে কেউ 'ভাগা', কেউ 'জিরো', কেউ 'ভাউচার' ইত্যাদি নানা নামে বদলি শ্রমিক হিসাবে নিজেকে বেচতে বাধ্য হচ্ছে। এই কাজও আবার পেতে গেলে সেই নেতাদের শরণাপন্ন হতে হবে। বিনিময়ে ওই সামান্য মজুরির একটা ভাগও তাদের দিতে হচ্ছে। এইসব পরিবারের অনেকেরই শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মাঝপথে। ড্রপ-আউট বাড়ছে। বেড়ে চলেছে মাফিয়ারাজ। যেখানে সেখানে মাঠ-পুকুর-প্রাচীন বসত হাপিশ হবার নেপথ্যে নেতারা। আর প্রকাশ্যে এসব শ্রমজীবী পরিবারগুলিরই ছেলেপুলেরা। গুন্ডা-মাস্তান-নেশাখোর-ড্রাগ পেডলার এবং নিষিদ্ধ রমণী তৈরির বনাঞ্চলে পরিণত হয়েছে একসময়ের শিল্পাঞ্চল।

নদীয়া জুট মিল যে সময় থেকে লাটে তোলার খেলা শুরু হয়, ঠিক সেই ১৯৮৫-৮৬ সাল থেকেই গৌরিপুর জুট মিলেরও বারোটা বাজার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কী অদ্ভুত সাদৃশ্য! এইসময় থেকেই শুরু হয় বারবার মালিকানা বদলের নাটক। নদীয়া মিলের মতোই বারবার হাতবদল, ফড়ে-প্রমোটারদের জুট মিলের ব্যবসায়ে অনুপ্রবেশ, ইউনিয়ন নেতাদের সীমাহীন দুর্নীতি ও মালিক শোষণের মধ্যে কোনরকমে চলতে চলতে অবশেষে ১৯৯৭ সালের ১২ ডিসেম্বর থেকে স্থায়ীভাবে মিল বন্ধ হয়ে যায়। তখন শ্রমিক সংখ্যা ৪২০০ জন। স্থায়ী শ্রমিক ২৬০০। ১৯৯৭ সালেই কারখানাটি লিকুইডেশনে যায়। তখন থেকেই শুরু হয় আরেক খেলা। মিলের বাড়িঘর-যন্ত্রপাতি-দরজা-জানলা ভেঙে টুকরো টুকরো করে সকলের চোখের সামনে বিক্রি করা হতে থাকে দিনের পর দিন বিনা প্রতিবাদে। নেতারা নীরবে প্রশ্রয় দিয়ে গেছে এসব কাজে। অন্যদেরও দমিয়ে দিয়েছে নানা কৌশলে, যাতে কোনও প্রতিবাদ না হয়। সাথে চলেছে প্রতিশ্রুতি। লোকসভা-বিধানসভা-পৌরসভা, যখন যে ভোট এসেছে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি — 'এবার জিতলেই কারখানা খুলবে। আমাদের ভোট দাও'। কিন্তু সেই মেহের আলীর চিৎকার — সব ঝুট হ্যায়। কারখানা খোলেনি। ছেয়ে গেছে জঙ্গলে। তাতে অন্ধকার আরও ঘন হয়েছে। আর সেই ঘনত্বে সাফা হয়েছে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ। আর কাটমানি চলে গেছে সহায়কদের পকেটে। গরিফা গঙ্গার ঘাট থেকে স্টেশন যেতে পড়ে কামারপাড়া। মুসলিম কারিগরদের পাড়া। রেলের জমি দখল করে এদের বসতি। দারিদ্র অপরিসীম। যেখানে শিক্ষা স্বাস্থ্য সব অবাস্তব। পুলিশ বলে, 'এরা চাইলে এক ঘণ্টায় হুগলী ব্রীজটাকে খুলে বেচে দিতে পারে। এরা, এদের অসহায়তা, ঠিকানাহীনতা, ভবিষ্যতহীনতা — সব বিচারে তাই এরা শাসক দলের ভৃত্য। সমাজবিরোধী-চোর-ডাকাত তৈরির এই বড়ো আকরটি এতদিন ছিল নেতাদের নির্বাচনে জেতানোর অস্ত্র। এখন এদের ব্যবহার করা হচ্ছে গৌরিপুর মিল সহ বিভিন্ন বন্ধ কারখানার মালপত্র হাওয়া করে দিতে। আর গোপনে নয়, চোখের সব আবরণ সরিয়ে এবার প্রকাশ্যে। কারখানার গায়ে ভ্যান-ম্যাটাডোর দাঁড় করিয়ে চোরাই মাল ভরাট করে চালান হতে শুরু করল প্রতিদিন। কামারপাড়া ও আশপাশের বিভিন্ন গোডাউনে জমা হতে লাগল সেসব মাল। আটকানোর কেউ নেই। কে আটকাবে! পুলিশ, পার্টি সকলেই তো খুশ। মালিকও খুশ। জমি সাফা হচ্ছে। পারলে মিলের খাতাপত্তরও হাপিশ করে দাও। তাও শুরু হল। ২০০৮-এর অক্টোবরে কারখানার লোহালক্কড় ভরা একটি ম্যাটাডোর ধরা পড়ল। লোহালক্কড়ের তলায় শ্রমিকদের হাজিরা খাতা ও আরও অনেক কাগজপত্র। গৌরিপুর জুট মিলের সীল দেওয়া। গৌরিপুর মজদুর বাঁচাও মঞ্চের কর্মীরা বারবার নৈহাটি থানাতে খবর দিলেও তারা আসতে চাইল না। সিটুর নেতাদেরও এ নিয়ে কোন উৎসাহ দেখা গেল না। অস্বাভাবিক অনুৎসাহ! শেষ পর্যন্ত জেলা পুলিশ প্রধানকে ফোন করে বলার পর কাজ হয়। ততক্ষণে ম্যাটাডোর গোডাউনে চলে গেছে। সব কিছু হাওয়া। কিন্তু তখনও রাস্তায়, গোডাউনের চারপাশে গৌরিপুর মিলের ছাপ মারা ছেঁড়া কাগজ ছড়িয়ে আছে। পুলিশ এসে সব দেখে ফিরে গেল।

সমাজবিরোধী লাগিয়ে কাগজ সরানো এই প্রথম নয়। মজদুর বাঁচাও মঞ্চ বারবার তা নিয়ে থানায় জানিয়েছে। পিএফ দপ্তরেও জানিয়েছে। পুলিশ নিষ্ক্রিয়! বর্তমান এমএলএ রঞ্জিত কুণ্ডু সব জেনেও চুপ! ওনাদের এত শক্তি, সংগঠন! ওনারা কি পারতেন না এসব আটকাতে? পারতেন। কিন্তু আটকাবেন না। কারণ, ওনারা তো চানই যে সব হিসেব গায়েব হোক।

তাছাড়া তলার সারির কর্মীদের দুটো পয়সা আয়ের রাস্তা না করে দিলে তো তাদের পুকুর চুরিতে অসুবিধা। কোটি কোটি টাকার ব্যাপার। পিএফ–এর কোটি কোটি টাকা, ৮০০ একর জমি, প্রোমোটিং হলে নানারকম বরাত — এরকম উচ্ছল পুকুর চুরি করতে গেলে কিছু গুঁড়োগারা তো চ্যালা চামুণ্ডাদের মধ্যে ছড়াতে হবেই। অতএব চেপে যাও। মিলের খালি কোয়ার্টারগুলো নাকি নেতারা ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন বহিরাগতদের। যে মাঠে ছেলেরা খেলাধুলা করত, রোলার চালিয়ে ক্রিকেট পিচ বানাত, সেখানে এখন খাটালের গরু মোষ চরে। খাটালের ভাড়াও ভালোই পাওয়া যাচ্ছে। চারদিকে বেআইনি মদের ঠেক। কে আটকাবে? এখানেও তো কাটমানি।

১৯৯৭ সালের পর থেকে আজ অবধি, গত ১২ বছরে গৌরিপুর মিলের অন্তত ৫০০ জন শ্রমিক মারা গেছে। এই মৃত শ্রমিকদের প্রায় সবারই পঞ্চাশের কোঠায় বয়স। অনাহার, অর্ধাহার, অপমান, অবসাদ, পরিবারের ভেঙ্গে পড়া — এসবই তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। কারখানা বন্ধ থাকা এবং বকেয়া টাকা না পাওয়াই এই অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ। অথচ এরা প্রত্যেকে পিএফ, গ্রাচুইটি বাবদ কমপক্ষে দেড় লক্ষ টাকা পায় কোম্পানির কাছ থেকে। তারাই অভাবে, বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। এদের পরিবারের সন্তানদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ছেলেটির ভবিষ্যৎ চুল্লু–গাঁজা–জুয়া–চুরি–মাস্তানি। আর পরিবারের মেয়েটির ভবিষ্যৎ বাবুর বাড়ি কাজ করা, কিংবা কোন অবৈধ অনৈতিক কর্মসংস্থান। আর শ্রমিকের মেহনতের সেই কোটি কোটি টাকা নিয়ে বেপাত্তা মালিক — নেতা। তাদের সন্তানেরা দেশে–বিদেশে ডাক্তারি–ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশন ফি দিয়ে, সেক্টর ফাইভে বা ওরকম কোথাও চাকরি করছে, শপিং মলে বাজার সারছে। মালিকের সেই চুরির টাকা অন্য শিল্পে বিনিয়োগ করছে। তারা বিনিয়োগকারী। সরকারের দৃষ্টিতে শিল্পোদ্যোগী। রাজ্যের বন্ধু, বেকারের ভগবান। দুধ সাদা পোষাকদুরস্ত লাল নেতারা ইদানীং বলছেন, 'শিল্পপতিরা শ্রমিকের দুশমন নয়'। কথার মার প্যাঁচে না গিয়ে কবীর সুমনের সেই গানটা বরং উচ্চারণ করুন — 'কেউ যদি বেশি খায়, খাবার হিসাব নাও। কেন না অনেক লোক ভালো করে খায় না'। গৌরিপুর মিল কর্তৃপক্ষের থেকে বিভিন্ন সরকারি ব্যাংক পায় প্রায় ১০০ কোটি টাকা যা তারা ঋণ নিয়ে শোধ দেয়নি। কেবল এলাহাবাদ ব্যাঙ্কই পায় ৫০ কোটি টাকা। ব্যাঙ্ক রিসিভার বসায়। মিলের যাবতীয় কাগজপত্র তারা সিজ করে নিয়ে যায়। ট্রাস্টি বোর্ড আবেদন জানায়, এইসব খাতা তাদের ফেরত দিলে, তার হিসাব নিকাশ করে শ্রমিকদের বকেয়া টাকা দিতে পারে। শ্রমিকদের কথা ভেবে কোর্ট ব্যাংককে সেসব খাতা দিতে বলে। কিন্তু খাতা পাবার পর ট্রাস্টি চুপ মেরে যায়। টাকার দেবার নামগন্ধ করে না। তবে পালানোর জায়গা ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। লিকুইডেটর যখন এইসব খাতা ট্রাস্টিকে দেয়, তখন স্ট্যাম্প পেপারে লিখিয়ে সই করে নেয়। ফলে, হিসাব নেই — এই কথা তারা বলতে পারবে না। এখন ট্রাস্টির বক্তব্য — পিএফ দপ্তরকে মানি না। তাদের হিসেব দেব না। বাঃ! দারুণ! তবে পিএফ–এর টাকা গায়েব হলেও পিএফ দপ্তর মনে করলে তা দিতে পারে। গোটা দেশের আনক্লেইমড পিএফ–এর একটি ফান্ড আছে। তার পরিমাণ প্রায় নয়শ কোটি টাকা। সেখানে থেকে তারা এই টাকা দিতে পারে। কিন্তু হিসাব না থাকলে দেওয়া সমস্যা। ট্রাস্টি এবং BCMU (সিটু)-র দাবি, 'বন্ধ মিলের শ্রমিকদের পিএফ বা পেনশন হয় না। তাই এরকম কোন টাকা শ্রমিকরা পাবে না'। তাহলে এতদিন শ্রমিকদের থেকে যে টাকা কাটা হল, তার কী হবে? যখন ট্রাস্টি দেখল বকেয়া টাকা পাবার সম্ভাবনা ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে, তখন এরা লিকুইডেটরের থেকে হিসাবপত্তরের খাতা চেয়ে আনে — এটা আগে বলেছি। কোর্ট খাতাপত্র দেবার অনুমতি দিয়েও রায়ের সাথে একটি কথা জুড়ে দেয়। তা হল, খাতাপত্র দেখে টাকা বিলি করুন, কিন্তু তা পিএফ দপ্তরের হিয়ারিংয়ের ভিত্তিতে। কিন্তু হিসাব নিজেদের হেপাজতে নিয়েই ট্রাস্টির অন্যমূর্তি। তারা বলল, পিএফ দপ্তরকে মানি না। সব টাকা দেব না। কেবল শ্রমিকরা যে টাকা দিয়েছে, তার ৭৫ শতাংশ দেব। সুদ ছাড়া। অর্থাৎ সেই হিসাবে, যার বকেয়া ১ লাখ, সে পাবে ১৫–২০ হাজার টাকা। কিন্তু মজদুর বাঁচাও মঞ্চ তখন ময়দানে সক্রিয় হয়ে পড়েছে। মানুষের সমর্থন তাদের ওপর বেড়ে চলেছে। অন্য ছয়টি ইউনিয়নের ওপর থেকে সমর্থন সরে গেছে। শ্রমিকরা বুঝে যায়, পেতে দেরি হলেও, এটাকা মারা মুশকিল। তাই তারা ট্রাস্টির প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। মজদুর বাঁচাও মঞ্চ জানিয়ে দেয়, পিএফ দপ্তরের হিয়ারিংয়ের ভিত্তিতেই তারা টাকা নেবে। ফলের ট্রাস্টির পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। এছাড়াও পিএফ দপ্তর ট্রাস্টিকে চিঠি দিয়ে জানতে চায়, 'তারা যে টাকা বিলির কথা বলছে, তা কোন হিসাবের ভিত্তিতে'। ফলে ট্রাস্টি আইনত টাকা কাউকেই দিতে পারেনি। এখন ট্রাস্টি এবং প্রধান ছ'টি ইউনিয়ন মিটিং মিছিলে সর্বত্র বলে বেড়াচ্ছে যে, তারা শ্রমিকদের বকেয়া মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেও মজদুর বাঁচাও মঞ্চ এবং BCMF (বেঙ্গল চটকল মজদুর ফোরাম) তা করতে দিল না। কিন্তু দুধকা দুধ, পানিকা পানি এখন আলাদা হয়ে গেছে। শ্রমিকদের আর এসব ভাঁওতা দেওয়া যাচ্ছে না। এক দিকে ছ'টি ইউনিয়ন এককাট্টা হয়ে ট্রাস্টির পক্ষে ময়দানে নেমে গেছে। অপর দিকে BCMF প্রভাবিত 'গৌরিপুর মজদুর বাঁচাও মঞ্চ' শ্রমিকস্বার্থে লড়ে যাচ্ছে।

এবার আসুন, এই দু'পক্ষের একটু পরিচিতি নেওয়া যাক। ক্ষমতাসীন এই ছ'টি ইউনিয়নই এতদিন এখানে মাতব্বরি করেছে। শ্রমিকরা তাদের বিশ্বাস করেছিল। প্রধান ইউনিয়ন হল বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন। এরা সিটু নিয়ন্ত্রিত। এর মাথা সিপিআইএমের স্থানীয় বিধায়ক রঞ্জিত কুণ্ডু। বেশিরভাগ শ্রমিক একসময় এদের সদস্য ছিল। বিভিন্ন নির্বাচনে, পার্টির দৈনন্দিন কাজে এরা সামনের সারিতে ছিল। এছাড়া আছে সিপিআইয়ের AITUC কংগ্রেসের INTUC–র দুটি গোষ্ঠী। আর আছে ভারতীয় মজদুর সংঘ (BMS)। এরা B.J.P–র শাখা সংগঠন। নৈহাটি ভারি মজার জায়গা! লাল ঝান্ডা–তেরঙ্গা–গেরুয়া ঝান্ডা সবাই এক হয়ে এখানে আন্দোলন করে। কেন করে, কার বিরুদ্ধে করে — জটিল সে সব অংক। সব কিছু গুলিয়ে দেবার অংক। অপর পক্ষে আছে একা BCMF। এরা AITUC–র নিয়ন্ত্রিত। ট্রাস্টি বোর্ডের সর্বশেষ নির্বাচনে জয়ী হয় BMS। আসলে এই BMS–এর কোন সংগঠন এখানে নেই। এদেরকে পিছন থেকে চালায় রঞ্জিত কুণ্ডু। তার নির্দেশ ছাড়া কোনও কাজই হয় না। আসলে গোটা ট্রাস্টিটাই ভুতুড়ে। ট্রাস্টির মোটা সদস্য সাতজন। দু'জন ম্যানেজমেন্ট মনোনীত। পাঁচজন শ্রমিকদের নির্বাচিত। ম্যানেজমেন্টের দু'জন হল মিঃ মিত্তাল আর কে কে চৌধুরি। মিত্তাল কোম্পানির অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার ছিল। তিনি ট্রাস্টির চেয়ারম্যান। তাঁর কোন খোঁজ নেই। তিনি জীবিত, না মৃত, বা বর্তমানে কোথায় আছেন কেউ জানে না। পরবর্তী সময়ে মিলের লেবার অফিসার স্বপন বিশ্বাসকে ট্রাস্টিতে নেওয়া হয়। ট্রাস্টির পক্ষ থেকে বর্তমানে সব কাজ তিনিই করেন। অঘোষিত চেয়ারম্যান তিনিই। ইনি প্রতিটা পা ফেলেন বিধায়কের নির্দেশে। শ্রমিক-প্রতিনিধি পাঁচজন। BMS–এর। অবাক কাণ্ড BCMU–র কেউ নেই। পাঁচজনের একজন রঘুনাথ যাদব মারা গেছেন। আরেক জন মুসলিম। এখানে থাকেন না। কেউ নাম বলতে পারে না। বাকি তিনজন — বিষ্ণুদেও দাস, সমীর ঘোষ ও গোরক্ষনাথ গোড়।

এদের সবার শত্রু গৌরিপুর মজদুর বাঁচাও মঞ্চ। সিপিআইএম, কংগ্রেস, বিজেপি সবাই যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এদের বিরুদ্ধে। মঞ্চের নেতাদের ওপর নেমে এসেছে অনেক হামলা, খুনের হুমকি। সিটু এবং অন্য ইউনিয়নগুলি বর্তমানে প্রায় উঠে গেছে। সিটুর দপ্তর খোলার কেউ নেই। সদস্য পুনর্নবীকরণ হচ্ছে না। কোন কর্মসূচীতে ৪০-৫০-এর বেশি শ্রমিক আসে না। সিটু ভেঙ্গে দলে দলে শ্রমিকরা মঞ্চে যোগ দিয়েছে। অন্যদের হালও তথৈবচ। তাঁত বিভাগের ছোটেলাল সাউ কিংবা রামাশংকর পাসোয়ান রাই একসময় ৬০-৭০ দশকে কংগ্রেসী আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জঙ্গি লড়াই লড়েছিলেন। আজ তারাই সিপিআইএম-সিপিআইকে অভিসম্পাত করে। এখন তারা মঞ্চের নেতা। গরিফায় মঞ্চের অফিসে সকাল কিংবা সন্ধ্যা যখনই আপনি যাবেন, দেখবেন, সবসময় গমগম করছে। তরুণ-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা শ্রমিকের বৃত্ত সে অফিসকে ঘিরে। মনে পড়ে, নব্বইয়ের দশকের কানোরিয়া জুট মিলের সেই লড়াইয়ের দিনগুলিকে। প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নগুলির মুখে পদাঘাত করে এভাবেই সেদিন গড়ে উঠেছিল এক অন্য স্বপ্ন। অন্য ইউটোপিয়া। সেদিনের আন্দোলন ব্যর্থ হতে পারে। কিন্তু স্বপ্ন কখনও ব্যর্থ হয় না। আজ গৌরিপুর জুট মিলের লড়াই তো সেই স্বপ্নেরই অংশ। গৌরিপুরের এই লড়াই আজ গোটা শিল্পাঞ্চলকে পথ দেখাচ্ছে। যেমন ১৯২২ সালে সন্তোষ কুমারী গুপ্তা দেখিয়েছিলেন। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

পাঠক ভাবতে পারেন, এই লেখা যেন BCMF কিংবা মঞ্চের প্রচারপত্র। আমি বলব, দয়া করে একবার নৈহাটির গরিফায় ঘুরে আসুন। মনে আছে, নব্বইয়ের দশকে কাতারে কাতারে মানুষ স্বপ্ন দর্শন করতে ভীড় জমাতো কানোরিয়ায়। গরিফার যে কোন রিক্সাচালক, হকার, ফেরিওয়ালা, দোকানি — যাকে খুশি জিজ্ঞেস করুন এই ইউনিয়নের কথা। দেখবেন, তার চোখে ফুটে উঠবে সম্ভ্রম। একদিকে দুধ সাদা পোশাকের, গোলাপি চামড়ার শ্রমিকনেতা, জনপ্রতিনিধি। আরেকদিকে বাপী সেনগুপ্ত, নব্যেন্দু দাশগুপ্ত। রোদে পোড়া ত্বক, না কাটা দাড়ি, মামুলি পোশাক, শরীরে মাটির গন্ধ। আপনার কিছুই করার নেই। নিরপেক্ষতার কোন জায়গা নেই। এদেরকেই বেছে নেবে আপনার মনন, চিন্তন। কারণ হাজারো শ্রমিকও তো তাই করেছে। বাকি সব ঝুটা। বন্ধ সিটু অফিসের চারধারে যেন মেহের আলীর চিৎকার বেড়ে চলেছে —— 'সব ঝুট হ্যায়'।

শেষ পরিস্থিতি

গত ১০ নভেম্বর থেকে টিটাগড় পিএফ অফিসের সামনে শ্রমিকরা অনশন শুরু করে বকেয়া টাকার দাবিতে। ১২ তারিখ অ্যাডিশনাল সেন্ট্রাল পিএফ কমিশনারের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতিতে অনশন প্রত্যাহার হয়। মঞ্চ এবং পিএফ দপ্তর ট্রাস্টির কাছে কাগজপত্র ফেরত চেয়ে হাইকোর্ট কেস করে। দু'বার হিয়ারিংয়ে কেউ উপস্থিত হয়নি। ১৭ ডিসেম্বর চূড়ান্ত হিয়ারিংয়ে হাইকোর্ট শ্রমিকদের পক্ষে রায় দিয়েছে। শ্রমিকদের পেনশন পাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পিএফের সমস্যারও সমাধান এবার হবে। এই পর্যায়ে শ্রমিকদের লড়াই সফল হয়েছে। যেসব খাতাপত্তর হাপিশ হয়ে গিয়েছিল, আদালতের নির্দেশে পুলিশ দিয়ে তা উদ্ধার করা হয়েছে।

চিঠিপত্র

বিষয় : সম্পাদকীয়/ আমার জ্বলেনি আলো

প্রিয় সম্পাদক,

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৮ সংখ্যায় দীপেন সেনগুপ্তের চিঠি পড়ে আমি দু-একটি কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। তিনি মন্থনে প্রকাশিত প্রতিবেদনের চতুর্থ প্যারায় হোঁচট খেয়েছেন, যার শেষ লাইনটি হল, "একটা পরিবার, সমাজ বা জনগোষ্ঠীও বেঁচে থাকার যুক্তিতে সেই ক্ষমতা বা পাওয়ারকে অনুমোদন দেয়।" তাঁর মত এই সংজ্ঞা দিয়ে হাজার হাজার বছর আগে যাযাবর মনুষ্যকুলের চারণভূমি নিয়ে যুদ্ধকে ব্যাখ্যা করা যায়, আধুনিক সাম্রাজ্যবাদকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই পরমাণু শক্তির নিরিখে আমেরিকা, রাশিয়া, চীনকে একাসনে বসিয়ে দেওয়া, 'নিউক্লিয়ার ডেটারেন্স'-এর নিন্দেমন্দ করার মধ্যে এই তরলতাই সঞ্চারিত হয়েছে।

বস্তুত তিনি আমেরিকার সঙ্গে চীন এবং রাশিয়ার ক্ষমতা প্রকাশের পার্থক্য দেখেছেন। আমেরিকা সাতশ সামরিক ঘাঁটি বানিয়েছে, চীন বা রাশিয়া এসব করেনি। তাহলে তিব্বতে চীনের দাদাগিরি এবং একটু অদূর অতীতে আফগানিস্তানে সোভিয়েত রাশিয়ার সেনা পাঠানো কোন ক্ষমতার দিকনির্দেশ করে। একসময় রাশিয়া ভারত সহ পৃথিবীর কিছু দেশকে এবং আমেরিকা পাকিস্তান সহ অন্য কিছু দেশকে ভাগবাটোয়ারা করে ক্ষমতার যে মদমত্ত হুঙ্কার দিত, যার পোশাকি নাম কোল্ড ওয়ার, সেখানে কোনটা ক্ষমতার মৃদুভাষা আর কোনটা কর্কশকন্ঠ, তা বোঝা গেছে কি? আমেরিকা যেমন মানবতা হরণকারী, রাশিয়া ও চীনেও সেরকম মানবতা হরণ করা হয়েছে। পার্টির স্বার্থকে দেশের স্বার্থ হিসেবে চিহ্নিত করতে গিয়ে চীনে SEZ করার নামে হাজার হাজার মানুষকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, কমিউন ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তাই বন্ধু, হাজার হাজার বছর আগে ক্ষমতা জাহির করাটা ভ্রূণাকারে ছিল — এখন তা দৈত্যাকার রূপ নিয়েছে। কিউবার বিপ্লব রাশিয়া বা চীনের পথ ধরে এগোয়নি বলে হয়তো টিকে আছে — যদি আমেরিকার সঙ্গে ক্ষমতার পাল্লা দিত, তাহলে কবে শেষ হয়ে যেত।

সুজয় বসু তাঁর নিবন্ধে কোথাও বলেননি, পরমাণু বিদ্যুতের প্রয়োজন আছে, বরঞ্চ সৌরশক্তির জয়গান করেছেন। তিনি লিখেছেন, "শিল্পযুগের বিচ্যুতির পর প্রকৃতির সঙ্গে সুস্থ সমন্বয়কে অগ্রাধিকার দিয়েই বাঁচবার শিক্ষা নিতে হবে। মানুষের ক্রমমুক্তির এই একটি পথই আজ রয়েছে।" পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে তা কখনও সম্ভব নয়।

আবার মন্থন মে-জুন ২০০৭ সংখ্যায় হেলেন ক্যালডিকটের বই Nuclear power is not the answer to global warming or anything else থেকে মন্থন যে অনুবাদ করেছে, তাতে দেখানো হয়েছে, পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির সমস্যায় পরমাণু বিদ্যুৎ কোন সমাধানই নয়। এই প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে যেটা লেখা আছে তা স্মরণ করা যাক, দীর্ঘ আলোচনার শেষে লিউএন ও স্মিথ সিদ্ধান্তে আসেন, "সব কিছু অনুকূল হলে পরমাণু বিদ্যুৎ গ্যাসীয় তাপবিদ্যুতের চেয়ে দুই-তৃতীয়াংশ কম কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ ঘটায়। এই অবনমনের জন্য যে গুণমানের ইউরেনিয়াম লাগবে তা ন'বছরে শেষ হয়ে যাবে যদি গোটা পৃথিবীকে পরমাণু বিদ্যুতে চালাতে হয়। আর এর থেকে কম গুণমানের ইউরেনিয়াম ব্যবহারে কার্বন ডাইঅক্সাইডের নিঃসরণ তাপবিদ্যুতের তুলনায় বেশি হবে।" তাই যদি কেউ চীনে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র আছে, অতএব ভারতবর্ষেও পরমাণু বিদ্যুতের পক্ষে সওয়াল করে, তা অবশ্যই সুবিবেচকের কাজ হবে না।

পরমাণু বিদ্যুৎ, কেমিকাল হাব প্রভৃতি প্রশ্নে বামপন্থীদের সঙ্গে ডানপন্থীদের বিভেদ নেই বললেই চলে। তাই মহঃ সেলিম ও রাহুল গান্ধী

... *পরবর্তী অংশ ৭ পৃষ্ঠায়*

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক সি-৫৬৪, ফতেপুর প্রথম সরণী, গার্ডেনরীচ, কলি-২৪ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, কলি-৯ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক জিতেন নন্দী।
ওয়েবসাইট : http://manthansamayiki.googlepages.com/, ই-মেল : jiten_nandi@vsnl.net, দূরভাষ : 2491-3666